মাসিক

# আল-আবরার

The Monthly AL-ABRAR

রেজি. নং-১৪৫ বর্ষ-৭, সংখ্যা-০২

মার্চ ২০১৮ ইং, জমাদিউস সানী ১৪৩৯ হি., ফাল্গুন ১৪২৪ বাং

الأبرار

مجلة شهرية دعوية فكرية ثقافية اسلامية

جمادى الثانى ١٤٣٩ھ، مارس ٢٠١٨م



প্রতিষ্ঠাতা

**ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আবদুর রহমান** (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)

প্রধান সম্পাদক

**মুফতী আরশাদ রহমানী**

সম্পাদক

**মুফতী কিফায়াতুল্লাহ শফিক**

নির্বাহী সম্পাদক

**মাওলানা রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী**

সহকারী সম্পাদক

**মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন**

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি

**মুহাম্মদ হাশেম**

সম্পাদনা বিষয়ক উপদেষ্টা

মুফতী এনামুল হক কাসেমী
মুফতী মুহাম্মদ সুহাইল
মুফতী আব্দুস সালাম
মাওলানা হারুন
মুফতী রফীকুল ইসলাম আল-মাদানী



সার্কুলেশন বিষয়ে যোগাযোগ

০১৯৭৮৪২৪৬৪৭


**বিনিময় : ২০ (বিশ) টাকা মাত্র**

## সূচিপত্র


**সম্পাদকীয়** ............................................ ২

**পবিত্র কালামুল্লাহ থেকে :** ............................ ৪

**পবিত্র সুন্নাহ থেকে :**

**'ফাজায়েলে আমাল' নিয়ে এত বিভ্রান্তি কেন-৩৯...** ৫

**হযরত হারদূয়ী (রহ.)-এর অমূল্য বাণী** ............. ৭

**ইফাদাতে ফকীহুল মিল্লাত :**

**সত্যিকার জ্ঞানী কারা**.................................. ৮

**"সিরাতে মুস্তাকীম" বা সরলপথ :**

**ঈমানদার হওয়ার চারটি শর্ত**........................... ১০

শায়খুল হাদীস আল্লামা মুফতী মনসূরুল হক্ব

**উভয় জাহানে শান্তি ও মুক্তির পথ**.................... ১৪

মাওলানা মুফতী আবুল কাসেম নুমানী

**মুবাল্লিগ ভাইদের প্রতি হযরতজির হেদায়াত-৩......** ২১

মুফতী শরীফুল আজম

**সব জাতির জন্য কি নবী এসেছেন?** ................. ২৪

মাওলানা শরীফ উসমানী

রাসূল (সা.)-এর প্রতি প্রেম-ভালোবাসা-৩

রাসূল (সা.)-এর প্রতি সাহাবায়ে কেরামের ভালোবাসা...........৩১

আল্লামা ড. শায়খ নূরুদ্দীন

**জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান** ............................ ৩৯

**ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস-১৮**........................... ৪৩

মাওলানা রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী



## যোগাযোগ

**সম্পাদনা দফতর**

মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ
ব্লক-ডি, ফকীহুল মিল্লাত সরণি, বসুন্ধরা আ/এ, ঢাকা।
ফোন : ০২-৮৪৩২০৯১, ০২-৮৮৪৫১৩৮
ই-মেইল : monthlyalabrar@gmail.com
ওয়েব : www.monthlyalabrar.wordpress.com
www.facebook.com/মাসিক-আল-আবরার

**মোবাইল:** প্রধান সম্পাদক: ০১৮১৯৪৬৯৬৬৭, সম্পাদক:০১৮১৭০০৯৩৮৩, নির্বাহী সম্পাদক:০১৮৩৮৪২৪৬৪৭ সহকারী সম্পাদক: ০১৮৫৫৩৪৩৪৯৯
বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি: ০১৭১১৮০৩৪০৯, সার্কুলেশন ম্যানেজার : ০১৯৭৮৪২৪৬৪৭

## সম্পাদকীয়

# বিপর্যয়ের মূলে প্রতিহিংসা

সম্প্রতি সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিস্থিতির অবনতি, অশান্তি এবং ভয়াবহ ফিতনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে পরস্পর উস্কানিমূলক আচরণ, বক্তব্য, প্রতিহিংসা এবং ঈর্ষা-বিদ্বেষ। এসব ইসলামী বিধানের পরিপন্থী এবং মুসলমানদের শানের সম্পূর্ণ খেলাফ। বিশেষ করে, পরস্পরবিরোধী প্রতিহিংসামূলক কথাবার্তা এবং উস্কানিমূলক বক্তব্য মুসলিম বিশ্বকে এক প্রকার বিপদোন্মুখ পরিস্থিতির দিকেই ঠেলে দিচ্ছে। রাজনৈতিক বিরোধ, ধর্মীয় বিরোধ, চিন্তাধারার পার্থক্য, সামাজিক মতদ্বৈততা, পারিবারিক বিরোধসহ প্রায় ক্ষেত্রেই যেন ওই মন্দ রীতিগুলোই চর্চিত হচ্ছে মুসলিম দুনিয়ায়।

এসব ক্ষেত্রে ইসলামের বিধান, রাসূল (সা.)-এর আদর্শ এবং সলফে সালেহীনের তরীকার প্রতি কেউ যেন নজর দেওয়ার গরজই মনে করছে না। একটি সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ সমাজ বিনির্মাণে রাসূল (সা.)-এর শাশ্বত বাণী হলো–

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِه.

মুসলিম সেই, যার জবান ও হাত থেকে অপরাপর মুসলিম নিরাপদ থাকে। (বোখারী শরীফ হা. ১০, মুসলিম শরীফ হা. ৪০)

:الْـمُسْـلِـمُ أَخُـو الْـمُسْـلِـمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ التَّقْوَى هَاهُنَا وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِحَسْبِ امْرِءٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ

‘এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সুতরাং কেউ কারো প্রতি অন্যায় করবে না, কেউ কাউকে অপদস্থ করবে না, তুচ্ছ ভাববে না। অতঃপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর হাত দিয়ে বুকের দিকে ইশারা করে তিনবার বললেন, পরহেযগারিতা এখানে আছে। মানুষের অনিষ্ট হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলিম ভাইকে তুচ্ছ ভাববে। প্রত্যেক মুসলমানের জন্য পরস্পরের রক্ত, অর্থ ও মর্যাদা খর্ব করা হারাম।’ (মুসলিম শরীফ হা. ৩২ [২৫৬৪])।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে–

يَـاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ.

হে মুমিনগণ! কোনো পুরুষ যেন অপর কোনো পুরুষকে উপহাস না করে; কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোনো নারী অপর নারীকেও যেন উপহাস না করে। কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না; ঈমান আনার পর মন্দ নাম অতি মন্দ। যারা এসব থেকে বিরত না হবে তারাই জালেম। (সূরা হুজুরাত : ১১)

يَـاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ.

হে মুমিনগণ! তোমরা অধিকাংশ অনুমান থেকে বেঁচে থাকো। কারণ কোনো কোনো অনুমান গোনাহ। তোমরা কারো গোপন ত্রুটির অনুসন্ধানে পড়বে না এবং একে অন্যের গীবত করবে না। তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? এটাকে তো তোমরা ঘৃণা করে থাকো। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু। (সূরা হুজুরাত : ১২)

রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন–

إِنَّ مِـنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ .وَكَيْفَ يَـلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ.

সবচেয়ে বড় কবীরা গোনাহ হলো, ব্যক্তি তার মা-বাবাকে গালি দেওয়া। এ কথা শুনে সাহাবীগণ বললেন, নিজের মা-বাবাকে আবার মানুষ গালি দেয় কীভাবে? উত্তরে

রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, ব্যক্তি কারো বাবা (মা)-কে গালি দেয়, তখন সে গালিদাতার বাবা-মাকে গালি দেয়। (বোখারী শরীফ, হা. ৫৯৭৩)

لَا يَـرْمِى رَجُلٌ رَجُلًا بِالْفُسُوقِ، وَلَا يَرْمِيهِ بِالْكُفْرِ، إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ.

কোনো ব্যক্তি যদি কাউকে ফাসেক বা কাফের বলে, আর তার মাঝে ফিসক বা কুফর না থাকে। তাহলে ওই কথা গালিদাতা ব্যক্তির দিকে ফিরে আসে। (বোখারী হা. ৬০৪৫)

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ، وَلَا اللَّعَّانِ، وَلَا بِالْفَاحِشِ، وَلَا بِالْبَذِىءِ

মুমিন (অন্যের) দোষ চর্চাকারী হয় না, লানতকারী, অশ্লীল ও গালাগালকারী হয় না। (তিরমিযী শরীফ হা. ১৯৭৭)

سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

মুসলমানকে গালি দেওয়া ফিসক (গোনাহের কাজ)। আর তাকে হত্যা করা কুফর। (বোখারী শরীফ হা. ৪৮; মুসলিম শরীফ হা. ৬৪)

يَـا رَسُـولَ الـلـهِ أَخْبِـرْنِـى بِعَمَلٍ يُدْخِلنِى الْجَنَّةَ وَيُبَاعِدنِى عَنِ

النَّارِ .أَلَا أُخْبِرُكَ بِمَلَاكِ ذَلِكَ كُلِّه؟ قُلْتُ :بَلَى يَا نَبِيَّ اللهِ، فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ قَالَ :كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا، فَقُلْتُ :يَا نَبِيَّ اللَّهِ !وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ؟ فَقَالَ :ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذُ، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِى النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ.

ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে এমন আমলের কথা বলে দিন, যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে এবং জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবে। [তখন নবীজি (সা.) তাকে দীর্ঘ উপদেশ দিলেন। একপর্যায়ে বললেন,] এ সব কিছুর মূল কী–আমি কি তোমাকে বলে দেব? আমি বললাম–জি, আল্লাহর রাসূল! তখন তিনি নিজের জিহ্বা ধরে বললেন, এটাকে সংযত করো। এ কথা শুনে আমি বললাম, আল্লাহর রাসূল! আমরা আমাদের কথাবার্তার জন্যও জিজ্ঞাসিত হব? নবীজি (সা.) বললেন, আ রে! জবানই তো মানুষকে অধঃপতনমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে! (তিরমিযী শরীফ হা. ২৬১৬; মাজাহ হা. ৩৯৭৩)

ইসলামের এরূপ অসংখ্য সুস্পষ্ট বিধান এবং উপদেশবাণী থাকার পরও মুসলিম উম্মাহের মাঝে অস্থিতিশীলতা ও অশান্তি থাকার কোনোই কারণ থাকতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা এবং রাসূল (সা.)-এর এসব উপদেশ ও আদেশ-নিষেধ তো সর্বস্তরের মুসলমানদের জন্য। কেউ এসব নিষেধাজ্ঞার উর্ধ্বে নয়।

বিভিন্নভাবে মানুষের মাঝে মতবিরোধ হতে পারে, চিন্তাধারার বেমিল সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু তা ফিতনায় পরিণত হওয়া এর মাধ্যমে প্রতিহিংসা এবং অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়া কারো জন্যই কল্যাণকর নয়।

মুসলমানদের মাঝে ধর্মীয় গবেষণাগত-মাযহাবগত অনেক মতপার্থক্য পূর্ব থেকেই আছে। কিন্তু কোনো সময় এর কারণে কোনো প্রকার অপ্রীতিকর কিছু ঘটেছে, এমন ইতিহাস পাওয়া যায় না।

সম্প্রতি কিছু ধর্মীয় বিষয়ে এক শ্রেণীর লোক অতি বাড়াবাড়ির মাধ্যমে যেন সমাজকে অস্থির করার অপপ্রয়াসে লিপ্ত। সামাজিক মিডিয়াসহ বিভিন্ন প্রচারমাধ্যমে প্রতিপক্ষকে আঘাত হেনে পোস্ট প্রচার করছে। ওয়াজ-মাহফিল বা মীলাদুন্নবীর নামে কুশ্রী ভাষায় প্রতিপক্ষকে গালাগাল করা, উস্কানিমূলক বক্তব্য দিয়ে মুসলিম জনসাধারণকে খেপিয়ে দাঙ্গা বাঁধানোর অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে এক শ্রেণীর মানুষ। উদ্ভট মিথ্যা প্রচারণার শেষ নেই। পুরো দেশের সব মানুষই যেন পরস্পর প্রতিপক্ষ। কি রাজনৈতিক, কি ধর্মীয়, কি সামাজিক–সর্বস্তরেই যেন পক্ষ-বিপক্ষ। সাথে প্রতিহিংসাও। এসব মুসলমানের শান হতে পারে না। মুসলমানকে রাসূল (সা.)-এর আদর্শে জীবন গড়তে হবে। সুন্নাতী জীবনে অনুপ্রবেশ করতে হবে। কিন্তু চলমান সময়ে যেন সুন্নাতবিরোধী কাজ করারই প্রতিযোগিতা। যারা যত বেশি রাসূল (সা.)-এর মুহাব্বতের দাবিদার তাদের মাঝে সুন্নাতের শূন্যতাই যেন তত বেশি। এসব কারণে সম্প্রতি দেশে বেশ কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে গেছে। আহত-নিহত হয়েছেন অনেকে। এই বিপর্যয়োন্মুখ পরিস্থিতিকে দীর্ঘায়িত হতে দেওয়া যায় না।

সকলকে মনে করতে হবে, এসব সুন্নাত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ারই করুণ পরিণতি। অন্তত যারা ধর্মের কথা বলেন, তাঁরা যদি সব কাজ সুন্নাতে নববী অনুযায়ী আঞ্জাম দেন তবে অন্তত ধর্মীয় বিষয়ে কোনো প্রকার প্রতিহিংসা থাকবে না। সুন্নাতী জীবনযাপনের প্রধান শর্ত হলো, রাসূল (সা.) কর্তৃক যাবতীয় নিষেধাজ্ঞা তথা প্রতিহিংসা, ঈর্ষা, বিদ্বেষ, কাউকে মন্দ বলা, উস্কানিমূলক বক্তব্য প্রদান, পরচর্চা, পরনিন্দা, গালি দেওয়া, কারো প্রতি খারাপ অনুমান ইত্যাদি সকল মন্দ পরিহার করা। মানুষকে মানুষ হিসেবে এবং মুসলমান হিসেবে মুহাব্বত করার গুণ অর্জন করা। ধৈর্য, স্থিতিশীলতা, ইবাদতের জযবা, দ্বীনি ইলম অর্জন, নম্রতা, উত্তম কথা বলা, মানুষের প্রতি উত্তম ধারণা, আত্মত্যাগ, মানবসেবা, উত্তম আচরণ ইত্যাদি গুণ অর্জন করা।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে সুন্নাতে রাসূল (সা.)-এর ওপর পরিচালিত হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

**আরশাদ রহমানী**
ঢাকা
২৭/০২/২০১৮ইং

# দুই ইলমী ব্যক্তিত্বের ইন্তেকালে মুফতী আরশাদ রহমানীর শোক

জামিয়া নূরিয়া কামরাঙ্গীরচর, ঢাকার সাবেক মুহতামিম আমীরে শরীয়ত হযরত মাওলানা আহমদুল্লাহ আশরাফ ও জামিয়া হুসাইনিয়া আরজাবাদা ঢাকার মুহতামিম হযরত মাওলানা মুস্তফা আযাদ সাহেব (রহ.)-এর ইন্তেকালে মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ, বসুন্ধরা, ঢাকার মহাপরিচালক, মাসিক 'আল-আবরার'-এর প্রধান সম্পাদক হযরত মাওলানা মুফতী আরশাদ রহমানী সাহেব গভীর শোক ও সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন। তিনি বলেন, তাঁদের ইন্তেকালে জাতি দুজন বড় ব্যক্তিত্বকে হারিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা যেন তাঁদের যাবতীয় দ্বীনি খিদমাতগুলো কবুল করেন এবং তাঁদের জান্নাতে সুউঁচ্চ মকাম দান করেন। তিনি মরহুমদ্বয়ের শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, ভক্ত-অনুরক্ত এবং ছাত্রদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। সকলকে সবরে জামীলের তাওফীক দানের জন্য আল্লাহ তা'আলার দরবারে দু'আ করেন।

# পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফ থেকে

## উচ্চতর তাফসীর গবেষণা বিভাগ :
## মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

بسم الله الرحمن الرحيم

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

হে আহলে কিতাবগণ! তোমাদের কাছে আমার রাসূল আগমন করেছেন, যিনি পয়গম্বরদের বিরতির পর তোমাদের কাছে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা এ কথা বলতে না পারো যে আমাদের কাছে কোনো সংবাদদাতা ও ভীতিপ্রদর্শক আগমন করেননি। অতএব তোমাদের কাছে সুসংবাদদাতা ও ভয়প্রদর্শক এসে গেছেন। আল্লাহ সব কিছুর ওপর শক্তিমান। (মায়েদা ১৯)

على فترة من الرسل – فترت এর শাব্দিক অর্থ মন্থর হওয়া, অনড় হওয়া এবং কোনো কাজকে বন্ধ করে দেওয়া। আলোচ্য আয়াতে তাফসীরবিদরা فتـــــرت এর শেষোক্ত অর্থই বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ পয়গম্বরদের আগমন পরম্পরা কিছুদিনের জন্য বন্ধ থাকা। হযরত ঈসা (আ.) আর শেষ নবী (সা.)-এর নবুওয়াত লাভের সময় পর্যন্ত যে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়েছে তাই فترت এর যমানা।

**فـترت এর যমানা কতটুকু :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, হযরত মুসা (আ.) ও হযরত ঈসা (আ.)-এর মাঝখানে এক হাজার সাত শ বছরের ব্যবধান ছিল। এ সময়ের মধ্যে পয়গম্বরদের আগমন একাধিকক্রমে অব্যাহত ছিল। এতে কখনো বিরতি ঘটেনি। শুধু বনী ইসরাইলের মধ্যে থেকেই এক হাজার পয়গম্বর এ সময়ে প্রেরিত হয়েছিলেন। বনী ইসরাইল ছাড়া অন্য গোত্র থেকেও অনেক পয়গম্বর আগমন করেছিলেন। অতঃপর হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্ম ও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নবুওয়াত লাভের মাঝখানে মাত্র পাঁচ শত বছরকাল পয়গম্বর আগমন বন্ধ ছিল। এ সময়টিকেই فتـــرت তথা বিরতির সময় বলা হয়। এর আগে কখনো এত দীর্ঘ সময় পয়গম্বরদের আগমন বন্ধ ছিল না। (কুরতুবী)

হযরত মুসা (আ.)-এর মাঝখানে কতটুকু সময় ছিল এবং হযরত ঈসা (রা.) ও শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মাঝখানে কতটুকু সময় ছিল, সে সম্পর্কে আরো বিভিন্ন রেওয়ায়াত বর্ণিত আছে, যাতে সময়ের পরিমাণ কমবেশি বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু এতে আসল উদ্দেশ্যে কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় না।

ইমাম বোখারী (রহ.) হযরত সালমান ফারসীর রেওয়াতক্রমে বর্ণনা করেন, হযরত ঈসা ও শেষ নবী (সা.)-এর মাঝখানে সময় ছিল ছয় শ বছর। এ সময়ের মধ্যে কোনো পয়গম্বর প্রেরিত হননি। বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফের বরাত দিয়ে মিশকাতে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, انـا اولـى الـنـاس بعيسى অর্থাৎ আমি ঈসা (আ.)-এর সবচেয়ে নিকটবর্তী। এর মর্ম হাদীসের শেষাংশে বলা হয়েছে। ليـس بيـنـنـا نبى অর্থাৎ আমাদের মাঝখানে কোনো পয়গম্বর প্রেরিত হননি।

সূরা ইয়াসীনে যে তিনজন রাসূলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাঁরা প্রকৃতপক্ষে ঈসা (আ.) কর্তৃক প্রেরিত দূত ছিলেন। আভিধানিক অর্থেই তাঁদের রাসূল বলা হয়েছে।

বিরতির সময়ে খালেদ ইবনে সিনান নবী ছিলেন বলে কেউ কেউ বর্ণনা করেন। এ সম্পর্কে তাফসীরে রূহুল মাআনীতে শিহাবের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে যে তিনি নবী ছিলেন ঠিক, কিন্তু নবুওয়াতকাল ছিল হযরত ঈসা (আ.)-এর পূর্বে, পরে নয়।

**অন্তর্বর্তীকালের বিধান :**

আলোচ্য আয়াত থেকে বাহ্যত বোঝা যায় যে, যদি কোনো সম্প্রদায়ের কাছে কোনো রাসূল, পয়গম্বর অথবা তাঁদের কোনো প্রতিনিধি আগমন না করেন এবং পূর্ববর্তী পয়গম্বরদের শরীয়তও তাদের কাছে সংরক্ষিত না থাকে তবে তারা শিরক ছাড়া অন্য কোনো কুকর্ম ও গোমরাহীতে লিপ্ত হলে তা ক্ষমার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। তারা আযাবের যোগ্য হবে না। এ কারণেই অন্তর্বর্তীকালের লোকদের সম্পর্কে ফিকাহবিদদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে যে, তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে কি না।

অধিকাংশ ফিকাহবিদ বলেন, তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে বলেই আশা করা যায়, যদি তারা নিজেদের ওই ধর্ম অনুসরণ করে, যা ভুলভ্রান্তিপূর্ণ অবস্থায় হযরত ঈসা অথবা মুসা (আ.)-এর সাথে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে তাদের কাছে এসেছিল। তারা একত্ববাদের বিরুদ্ধাচরণ ও শিরকে লিপ্ত হলে এ কথা প্রযোজ্য হবে না। কেননা একত্ববাদ কোনো পয়গম্বরের পথপ্রদর্শনের অপেক্ষা রাখে না। সামান্য চিন্তা-ভাবনা করে নিজস্ব জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারাই মানুষ তা জেনে নিতে পারে।

এখানে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, আলোচ্য আয়াতে যেসব ইহুদি ও খ্রিস্টানকে সম্বোধন করা হয়েছে, অন্তর্বর্তীকালে তাদের কাছে কোনো রাসূল আগমন না করলেও তাওরাত ও ইঞ্জিল তাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। তাদের আলেম সম্প্রদায়ও ছিল। এমতাবস্থায় "আমাদের কাছে কোনো সুসংবাদদাতা ও ভয়প্রদর্শক পৌঁছেনি" বলে তাদের ওজর পেশ করার কোনো যুক্তি ছিল কি না? উত্তর এই যে, হযরত রাসূলে কারীম (সা.)-এর আমল পর্যন্ত তাওরাত ও ইঞ্জিল অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান ছিল না। বিভিন্ন পরিবর্তনের ফলে তাতে মিথ্য ও বানোয়াট কিচ্ছা-কাহিনী অনুপ্রবেশ করেছে। কাজেই তা থাকা না থাকা সমান ছিল। ইবনে তাইমিয়া প্রমুখ আলেমের বর্ণনা অনুযায়ী, তাওরাতের আসল কপি কারো কাছে কোনো অজ্ঞাত স্থানে বিদ্যমান থাকলেও তা এর পরিপন্থী নয়।

(তাফসীরে মাআরিফুল কোরআন অবলম্বনে)

কোরআন মজীদের পর সর্বাধিক পঠিত কিতাব

# ফাজায়েলে আমাল নিয়ে এত বিভ্রান্তি কেন-৩৯

ফাজায়েলে আমালে বর্ণিত হাদীসগুলো নিয়ে এক শ্রেণীর হাদীস গবেষকদের (!) অভিযোগ হলো, হাদীসগুলো সহীহ নয়। এগুলোর ওপর আমল করা যাবে না ইত্যাদি। কিন্তু বাস্তবতা কী? এরই অনুসন্ধানে এগিয়ে আসে মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ, বসুন্ধরা ঢাকার উচ্চতর হাদীস বিভাগের গবেষকগণ। তাঁদের গবেষণালব্ধ আলোচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছে মাসিক আল-আবরার। আশা করি, এর দ্বারা নব্য গবেষকদের অভিযোগগুলোর অসারতা প্রমাণিত হবে। মুখোশ উন্মোচিত হবে হাদীসবিদ্বেষীদের।

হাদীসের তাখরীজ ও তাহকীকের কাজটি আরম্ভ করা হয়েছে ফাজায়েলে যিকির থেকে। এখন ফাজায়েলে নামাযের উল্লিখিত হাদীসগুলোর নম্বর হিসেবে একটি হাদীস, এর অর্থ, তাখরীজ ও তাহকীক পেশ করা হয়েছে। উক্ত হাদীসের অধীনে হযরত শায়খুল হাদীস (রহ.) উর্দূ ভাষায় যে সকল হাদীসের অনুবাদ উল্লেখ করেছেন সেগুলোর ক্ষেত্রে (ক. খ. গ. অনুসারে) বাংলা অর্থ উল্লেখপূর্বক আরবীতে মূল হাদীসটি, হাদীসের তাখরীজ ও তাহকীক পেশ করা হয়েছে।

**ফাজায়েলে নামায–দ্বিতীয় অধ্যায় :**

**জামা'আতের বর্ণনা**

**হাদীস নং-১.**

حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ :حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلَّم، قَالَ :صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضُلُ من صَلاَةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, জামা'আতের নামায একাকী নামায হতে ২৭ গুণ বেশি মর্তবা রাখে।

(বোখারী শরীফ ১/৮৯ হা. ৬৪৫, মুসলিম শরীফ ১/২৩১ হা. ১৪৭৭, নাসাঈ শরীফ ১/১৩৪ হা. ৮৩৭, তিরমিযী শরীফ ১/৫২ হা. ২১৫, মুআত্তা মালেক ১/১২৯, আততারগীব ওয়াত তারহীব ১/১৫৮ হা. ৫৭৪)

হাদীসটির মান : সহীহ

ক. হাদীস শরীফে আছে, যারা বেশি সময় মসজিদে অবস্থান করে, তারা মসজিদের খুঁটিস্বরূপ। ফেরেশতাগণ তাদের সঙ্গী হয়ে থাকেন। তারা অসুস্থ হলে ফেরেশতাগণ তাদের সেবা-শুশ্রূষা করে থাকেন। তারা কোনো কাজে গেলে ফেরেশতাগণ তাদের সাহায্য করে থাকেন।

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الدَّبَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، رَفَعَ الْحَدِيثَ، قَالَ " :إِنَّ لِلْمَسَاجِدِ أَوْتَادًا جُلَسَاؤُهُمُ الْمَلاَئِكَةُ يَتَفَقَّدُونَهُمْ فَإِنْ كَانُوا فِي حَاجَةٍ أَعَانُوهُمْ، وَإِنْ مَرِضُوا عَادُوهُمْ، وَإِنْ غَابُوا افْتَقَدُوهُمْ، وَإِنْ حَضَرُوا قَالُوا :اذْكُرُوا اللهَ ذَكَرَكُمُ اللهُ ـ

(মুসতাদরাকে হাকেম ২/৩৯৮ হা. ৩৫০৭, মুসনাদে আহমদ ২/৪১৮ হা. ৯৪২৪, মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ১১/২৯৭ হা. ২০৫৮৫, শু'আবুল ঈমান ৪/৩৮৩ হা. ২৬৯৪)

হাদীসটির মান : সহীহ

**হাদীস নং-২.**

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ، قَالَ : حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ، يَقُولُ :سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " :صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي الجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلاَتِهِ فِي بَيْتِهِ، وَفِي سُوقِهِ، خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا، وَذَلِكَ أَنَّهُ :إِذَا تَوَضَّأَ، فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى المَسْجِدِ، لاَ يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلاَةُ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً، إِلَّا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، فَإِذَا صَلَّى، لَمْ تَزَلِ المَلاَئِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ، مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ :اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، وَلاَ يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلاَةَ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, কোনো ব্যক্তির ওই নামায, যা জামা'আতের সাথে পড়া হয়েছে তা ঘরে বা বাজারে একাকী পড়া নামায হতে ২৫ গুণ বেশি সওয়াব রাখে। কেননা কোনো ব্যক্তি যখন উত্তমরূপে ওজু করে, অতঃপর মসজিদের দিকে একমাত্র নামাযের উদ্দেশ্যেই গমন করে, অন্য কোনো উদ্দেশ্য তার না থাকে তখন তার প্রতি কদমে একটি করে নেকী বেড়ে যায় এবং একটি করে গোনাহ মাফ হয়ে যায়। অতঃপর যখন নামায পড়ে ওই স্থানে বসে থাকে, যতক্ষণ সে ওজুর সাথে বসে থাকে ফেরেশতাগণ

তার জন্য মাগফিরাত ও রহমতের দু'আ করতে থাকেন। আর যতক্ষণ কেউ নামাযের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে, ততক্ষণ সে নামাযের সওয়াব পেতে থাকে।
(বোখারী শরীফ ১/৮৯ হা. ৬৪৭, মুসলিম শরীফ ১/২৩১ হা. ১৪৭৩, সুনানে আবু দাউদ ১/৮২ হা. ৫৫৯, সুনানে তিরমিযী ১/৫২ হা. ২১৬, সুনানে ইবনে মাজাহ ১/৫৭ হা. ৭৮৬)
হাদীসটির মান : সহীহ

ক.
যে ব্যক্তি ওজু করে শুধুমাত্র নামাযের উদ্দেশ্যে মসজিদে রওনা হয়, তখন মসজিদে প্রবেশ করা পর্যন্ত তার প্রতি কদমে একটি করে নেকী বৃদ্ধি পেতে থাকে আর একটি করে গোনাহ মাফ হতে থাকে।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْقَرَّاظِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ :إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ لَا يَنْزِعُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ إِلَّا الصَّلَاةُ لَمْ تَزَلْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى إِلَّا تَمْحُو عَنْهُ سَيِّئَةً، وَتَكْتُبُ لَهُ الْيُمْنَى حَسَنَةً، حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ
(আবু দাউদ শরীফ ১/৩৮০ হা. ৫৬৩, মুসতাদরাকে হাকেম ১/২১৭ হা. ৭৯০)
হাদীসটির মান : সহীহ

খ.
মদীনা শরীফে বনু সালামা নামে একটি গোত্র ছিল। তাদের ঘরবাড়ি মসজিদ হতে দূরে ছিল। তারা মসজিদের নিকটবর্তী কোনো স্থানে এসে বসবাস করতে ইচ্ছা করল। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তোমরা সেখানেই থাকো। তোমাদের মসজিদে আসার প্রতিটি কদম লেখা হয়।
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبِي، يُحَدِّثُ، قَالَ :حَدَّثَنِي الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ :خَلَتِ الْبِقَاعُ حَوْلَ الْمَسْجِدِ، فَأَرَادَ بَنُو سَلِمَةَ أَنْ يَنْتَقِلُوا إِلَى قُرْبِ الْمَسْجِدِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُمْ :إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَنْتَقِلُوا قُرْبَ الْمَسْجِدِ، قَالُوا :نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ أَرَدْنَا ذَلِكَ، فَقَالَ :يَا بَنِي سَلِمَةَ دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ آثَارُكُمْ، دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ آثَارُكُمْ
(বোখারী শরীফ ১/৯০ হা. ৬৫৫-৬৫৬, মুসলিম শরীফ ১/২৩৫ হা. ৬৬৫, সহীহে ইবনে খুজাইমা ১/২৩০ হা. ৪৫১, সহীহে ইবনে হিব্বান ৫/৩৯০ হা. ২০৪২, মুসনাদে আহমদ ৩/৩৩২ হা. ১৪৫৭৮)
হাদীসটির মান : সহীহ

গ.
এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি ঘর হতে ওজু করে নামাযের উদ্দেশ্যে রওনা হয়, সে যেন এহরাম বেঁধে হজের জন্য রওনা হলো।

حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ، حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا إِلَى صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيحِ الضُّحَى لَا يَنْصِبُهُ إِلَّا إِيَّاهُ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ، وَصَلَاةٌ عَلَى أَثَرِ صَلَاةٍ لَا لَغْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي عِلِّيِّينَ
(আবু দাউদ শরীফ ১/৮২ হা. ৫৫৮, আল মুজামুল কাবীর [তাবারানী] হা. ৫৫৮, সুনানে কুবরা ৩/৮৯ হা. ৪৯৭৩)
হাদীসটির মান : সহীহ

ঘ.
বহু হাদীসে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ইরশাদ বর্ণিত হয়েছে যে ইমাম যখন সূরা ফাতেহার পর আমীন বলেন, তখন ফেরেশতারাও আমীন বলেন। যে ব্যক্তির আমীন ফেরেশতাদের আমীনের সাথে একত্রিত হয়, তার অতীতের সকল গোনাহ মাফ হয়ে যায়।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ :أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " :إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ، فَأَمِّنُوا، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ
(বোখারী শরীফ ১/১০৮ হা. ৯৩৫-৯৩৬, মুসলিম শরীফ ১/১৮৬ হা. ৪১০, মুসনাদে আহমদ ২/২৩৩ হা. ৭২০৫)
হাদীসটির মান : সহীহ

*(চলবে ইনশাআল্লাহ)*

# মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক্ব হক্কী হারদূয়ী (রহ.)-এর

# অমূল্য বাণী

**তাজবীদের হাকীকত :**

কোরআন মজীদ তিলাওয়াতে প্রতিটি হরফ-বর্ণ সঠিকভাবে উচ্চারণ এবং তিলাওয়াতের যাবতীয় রীতি-নীতির অনুসরণ করতে হয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে :

ورتل القرآن ترتيلا

"তারতীলের সাথে কোরআন পাঠ করো।"

তারতীল কাকে বলে? হযরত আলী (রা.) বলেন :

تجويد الحروف ومعرفة الوقوف

বর্ণের সঠিকভাবে উচ্চারণ এবং ওয়াক্‌ফের বিধান সম্পর্কে অবগত হওয়া।

অর্থাৎ তারতীল বলা হয় প্রতিটি বর্ণকে তার মাখরাজ থেকে সঠিকভাবে উচ্চারণ করা এবং ওয়াক্‌ফ তার কায়েদা ও রীতি-নীতিসহ সঠিকভাবে আদায় করা।

যেখানে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে পবিত্র কোরআন তারতীলের সাথে তিলাওয়াত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেহেতু প্রত্যেক মুসলমানের প্রতি এই নির্দেশ এমনিতেই আরোপিত হয়েছে।

**তাজবীদ সহকারে পাঠ করাই আল্লাহ তা'আলার কাছে মকবুল :**

সুললিত কণ্ঠ আল্লাহ তা'আলার দান, যা নিজের এখতিয়ারবহির্ভূত। কিন্তু সঠিকভাবে তাজবীদ সহকারে পাঠ করা নিজের অর্জন। তা স্বকীয় এখতিয়ারের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে বস্তুটি এখতিয়ারবহির্ভূত তার জন্য চেষ্টা না করে যে বিষয়টি নিজ এখতিয়ারাধীন তা অর্জন করা আবশ্যক। কারণ মানুষ এর প্রতি আদিষ্ট। বোঝা গেল, আল্লাহ তা'আলার কাছে মকবুল হলো তাজবীদ সহকারে পাঠকারী। তাজবীদ ছাড়া সুললিত কণ্ঠে তিলাওয়াতকারী আল্লাহ তা'আলার কাছে মকবুল নয়।

**ওয়াক্‌ফের স্থানে পুনরাবৃত্তি :**

কোন স্থানে নিঃশ্বাস নেবে? কোন স্থানে ওয়াক্‌ফ করবে? এর রীতি-নীতি নির্দিষ্ট আছে। সে মতেই ওয়াক্‌ফ করা উচিত। আহলে ইলমদের উচিত ওয়াক্‌ফের পর পুনরাবৃত্তি করার সময় অর্থের প্রতি নজর রাখা।

**পবিত্র কোরআনের আশ্চর্য শান :**

পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন আশ্চর্যপূর্ণ শান রয়েছে। তার মধ্যে একটি হলো পবিত্র কোরআন বিভিন্নভাবে পড়া যায়। কিরাতের ১০ জন ইমাম রয়েছেন। এসব ইমামের পঠনরীতিকে কিরাতে সবআ এবং আশারা বলা হয়। এখন যে কিরাত আমাদের সামনে পড়া হলো, তাও একটি পদ্ধতি। পশ্চিমাদের সেখানে এই পদ্ধতি চালু রয়েছে। আমাদের এলাকায় এপদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞাত ব্যক্তি কম। এই পদ্ধতিও রাসূল (সা.) হতে বর্ণিত। এই পদ্ধতিটি হলো ইমাম নাফে (রহ.)-এর শাগরিদদের। নামাযেও এরূপ কিরাত পড়া যায়। কিন্তু আমাদের এলাকায় এতদসম্পর্কে লোকেরা অবগত নয় বিধায় এখানে পড়া বাঞ্ছনীয় নয়। তবে উৎসাহ জোগানো এবং আকৃষ্ট করার জন্য পড়া যায়। তবে পড়ার সময় এখন কোন কিরাত তিলাওয়াত করা হবে, তা পূর্বে বলে দেওয়া উচিত। যাতে ভুল-বোঝাবুঝি সৃষ্টি না হয়।

**পবিত্র কোরআনের বৈশিষ্ট্য :**

তিলাওয়াতে কোরআনের পর দু'আ কবুল হয়। এটি পবিত্র কোরআনের বৈশিষ্ট্যাবলির একটি। প্রতিটি উদ্দেশ্যের জন্য পরিপূর্ণ একটি দু'আ হলো :

اللهم انى اسئلك من خير ما سئلك منه نبيك محمد ﷺ ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد ﷺ۔

দু'আ হলো অন্তরের ডাক। শুধু মুখের শব্দাবলি দু'আর জন্য যথেষ্ট নয়। বরং কায়মনোবাক্যে দু'আ করতে হবে। পুরো মনোনিবেশ ও অন্তরকে হাজির রেখে দু'আ করতে হবে।

**কাউকে অপেক্ষায় না রাখা :**

কাউকেও অপেক্ষায় না রাখা উচিত। কোনো কাজের দায়িত্ব দেওয়া হলে তা কতটুকু হয়েছে, আদৌ হয়েছে কি না, তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানানো উচিত। কেউ কোনো পত্র বা পারচি দিল যে এটি অমুকের হাতে পৌঁছে দাও। ওই লোককে যদি পাওয়া না যায় তবে তা তাড়াতাড়ি জানিয়ে দেওয়া উচিত যে, তাকে পাওয়া যায়নি। বা পাওয়া গেলে বলে দিতে হবে যে, পৌঁছে দিয়েছি। যদি অবগত না করা হয় তবে প্রতীক্ষায় থাকতে হয়, যা উচিত নয়। যদি জিজ্ঞেস করা হয় কোথায় গিয়েছে। তখন চুপ থাকা উচিত নয়। বরং বলে দিতে হবে অমুক স্থানে গিয়েছে। মোটকথা হলো, কাউকেও প্রতীক্ষা ও অপেক্ষায় রাখা উচিত নয়।

**খবর পৌঁছানোর পদ্ধতি :**

কেউ যদি বলে অমুক ব্যক্তিকে এই খবরটা পৌঁছে দিও। তখন তাকে বলবেন, জনাব! কী বলতে হবে তা লিখে দিলে ভালো হয়। যদি সে লিখতে অক্ষম হয় তবে নিজে লেখে তাঁর ফিঙ্গারিং নিয়ে নিলে ভালো। যাতে খবরটা হুবহু পৌঁছায়। পরে যাতে বলতে না পারে যে তোমাকে বলল কী? আর তুমি কী বলে এসেছ? তাতে উভয় পক্ষের শান্তি আছে।

# ইফাদাতে

## হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)

*বিভিন্ন সময় ছাত্র-শিক্ষক ও সালেকীনদের উদ্দেশে দেওয়া তাকরীর থেকে সংগৃহীত*

# সত্যিকার জ্ঞানী কারা

জ্ঞানী ও মূর্খের মাঝে পার্থক্য বোঝার জন্য তিনটি জিনিস বুঝে নেওয়া জরুরি। এক. নেয়ামত, যা পৃথিবীজুড়ে বিস্তৃত। দুই. منعم حقيقى নেয়ামতের প্রকৃত দাতা, তিনি হলেন আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত। তিন. منعم عليه অর্থাৎ যাকে নেয়ামত দান করা হয়েছে, সে হলো মানুষ, যে নেয়ামত অর্জন করে ভোগ করে। মানুষ যদি নেয়ামতের গুরুত্ব বোঝে তাহলে সে অবশ্যই প্রকৃত দাতার প্রতি কৃতজ্ঞ অনুগত থাকবে। আর যে নেয়ামতের মধ্যে হারিয়ে যাবে; কিন্তু আসল দাতার কথা ভুলে যাবে তাকে তো মূর্খই বলা হবে। দেখুন, বর্তমান দুনিয়ায় আল্লাহর নেয়ামতের ওপর রিসার্চ করে তা অর্জন করার মধ্যেই হারিয়ে গেছে, আর নেয়ামতের প্রকৃত দাতাকে ভুলতে বসেছে, তার হুকুম পালনের তোয়াক্কা নেই। এটাই তো মূর্খতা, নির্বুদ্ধিতা।

**অল্প বিদ্যায় মর্যাদা লাভ হয় না :**

সামান্য বিষয়ের জ্ঞানকে মানুষ বড় কিছু ভাবে না, যেমন দুই-চার ক্লাস পড়ুয়া ব্যক্তিকে সমাজ জ্ঞানী মনে করে না। কারণ সামান্য বিষয়ের জ্ঞান সামান্য ও সীমিতই হয়ে থাকে, বেশি নয়। পার্থিব জ্ঞান দুনিয়ার নেয়ামত ভোগ করার জন্যই হয়ে থাকে। পার্থিব ভোগ-বিলাসিতার পরিধি কতটুকু এ ব্যাপারে নেয়ামতসমূহের প্রকৃত দাতা আল্লাহর বাণী হলো, قل متاع الدنيا قليل 'হে নবী! আপনি বলে দিন, পার্থিব ভোগ সামান্য।' (নিসা-৭৭)।

পার্থিব ভোগই যেহেতু সামান্য, তাই তার জ্ঞান ও আল্লাহর দৃষ্টিতে সামান্য। বরং আরো কম। কারণ যে বস্তু কম, তার জ্ঞানও কম হয়। যখন পার্থিব ভোগ্যসামগ্রীই সামান্য, তো এ ব্যাপারে সামান্য বিদ্যা কিভাবে বেশি হতে পারে? বাহ্যত এটাও সামান্য হবে। আর অল্প বিদ্যায় মানুষের মর্যাদা লাভ হয় না।

এ তো গেল দুনিয়ার ব্যাপারে আল্লাহর বাণী, আর পরকালের ব্যাপারে কী বলেছেন সেটাও দেখা যাক। আখেরাতের ব্যাপারে তিনি বলেন,

واذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا

'তুমি যখন সেখানে দেখবে, দেখতে পাবে ভোগ-বিলাসের উপকরণ এবং বিশাল সাম্রাজ্য।' (দাহর-২০)

পরকালের সাম্রাজ্যের জন্য كبير (তথা বিশাল, বড়) শব্দ ব্যবহার করেছেন। আর দুনিয়ার জন্য করেছেন قليل (তথা- কম, সামান্য) শব্দ ব্যবহার করেছেন, এর দ্বারা এতদ্বয়ের মাঝে সত্ত্বাগত ও বিদ্যাগত পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে গেল। যে দুনিয়া সামান্য, তার জ্ঞানও সামান্য। আর আখেরাতের সাম্রাজ্য বড়, তার জ্ঞানও বড়। কেমন বড় হবে তা একটি হাদীসের ভাষ্য থেকে অনুমেয়, যে সর্বশেষ জান্নাতি যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন তাকেও এ দুনিয়া থেকে দশ গুণ বড় জান্নাত দেওয়া হবে। বোঝা গেল, জান্নাতের মোকাবেলায় দুনিয়ার কোনো মূল্যই নেই। জান্নাতের রাজত্ব স্থায়ী রাজত্ব, যার ক্ষয় নেই। লয় নেই। পার্থিব জ্ঞান দ্বারা মানুষ মহাশূন্যে অবস্থিত ক্ষুদ্র, অতিক্ষুদ্রকার পৃথিবী নামক একটি গ্রহ থেকে সামান্য পরিমাণ উপকৃত হয়ে থাকে মাত্র। আর ইলমে দ্বীন ও ইলমে বাতেনীর মাধ্যমে মানুষ আখেরাতে সুবিশাল সাম্রাজ্য লাভের চেষ্টা করে থাকে। এর থেকেই দুনিয়ার বিদ্যার ও বিদ্যানদের মানগত পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে যায়।

**যার নুন খাইবে তার গুণ গাইবে :**

সমাজের নিয়ম হলো, কারো নুন খেলে তার গুণগান গাওয়া, আমরা যেহেতু দুনিয়াতে আল্লাহর নেয়ামত খাই, ভোগ করি, তাই তাঁরই গুণগান গাইব, তাঁর বিধান মেনে চলব। কারণ আমরা যদি নেয়ামতের মাঝে জীবন কাটিয়েও আল্লাহর বিধান মেনে চলি, তাঁকে স্মরণ করি, তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি তাহলে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরও نعم العبد উত্তম বান্দাদের মধ্যে শামিল করে নেবেন।

**মূর্খ কারা :**

আর যদি নেয়ামতের মাঝে ডুবে

থেকে আল্লাহকে ভুলে যাই তাহলে আমরা মূর্খদের কাতারে অন্তর্ভুক্ত হব। মূর্খ কারা এদের পরিচয় স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা কোরআনে বর্ণনা করেন। ইরশাদ করেন,

يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الاخرة هم غافلون

'তারা পার্থিব জীবনের বাহ্য দিক সম্পর্কে অবগত, আর আখেরাত সম্বন্ধে তারা বেখবর।' (রূম-৭)

যেমনিভাবে দু-চার ক্লাস পড়ায় লোকদের মানুষ মূর্খ বলে, তেমনিভাবে যারা দুনিয়ার জ্ঞান রাখে কিন্তু আখেরাতের ব্যাপারে বেখবর–এই ধরনের জ্ঞানী ব্যক্তিও আল্লাহর ঘোষণায় মূর্খ।

দেখুন! কম্পিউটার বিদ্যা, প্রকৌশলী বিদ্যা, ডাক্তারি বিদ্যা। এ ছাড়া দুনিয়ার যেকোনো বৈধ বিদ্যা অর্জন করাতে কোনো সমস্যা নেই। বরং প্রয়োজন আছে এবং ক্ষেত্র বিশেষে অতীব জরুরিও বটে। কারণ এগুলোও আল্লাহর নেয়ামত। কিন্তু এগুলোর ব্যবহার সঠিক স্থানে সঠিক পদ্ধতিতে হওয়া আবশ্যক। এর ব্যবহার যদি সঠিকভাবে না হয়, শুধু দুনিয়ার আরাম-আয়েশ এবং উদরপূর্তিই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে তা মানুষকে তার আসল উদ্দেশ্য থেকে সরিয়ে দেয়। তার মূল লক্ষ্যে পৌঁছতে বাধা সৃষ্টি করে। তাই লক্ষ্য স্থির করতে হবে, এমন যেন না হয় যে অল্পের পেছনে পড়ে বিশাল সাম্রাজ্যের কথা ভুলে যায়। আসল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য তো এটা যে আমরা আল্লাহর নেয়ামত ভোগ করব এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা আদায় করব, তাঁর বিধিবিধান মেনে চলব।

মনে রাখবে! যে বান্দা নেয়ামত পেয়ে প্রকৃত দাতাকে ভুলে বসে আল্লাহ তা'আলা তার ওপর অধিক ক্রোধান্বিত হন। এ ব্যাপারে কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে,

قتل الانسان ما اكفره

'মানুষ তার অকৃজ্ঞতার কারণে ধ্বংস হোক।' (আবাসা-১৭)

অতএব আমরা যেন শুধু দুনিয়ার বাহ্যিক জ্ঞান অর্জন করেই ক্ষান্ত না হই, কারণ এটা পার্থিব সামান্য ভোগের জ্ঞান, পাশাপাশি আমাদের প্রকৃত জ্ঞান যাকে আল্লাহ তা'আলা ملكا كبيرا বলেছেন সেই জ্ঞানও অর্জনে সচেষ্ট হতে হবে। আর এই জ্ঞান ইলমে বাতেনী লাভের মাধ্যমে অর্জন হয়।

**গ্রন্থনা : মুফতী নূর মুহাম্মদ**

'সিরাতে মুস্তাকীম' বা সরল পথ

# ঈমানদার হওয়ার চারটি শর্ত

শায়খুল হাদীস আল্লামা মুফতী মনসূরুল হক্ব

বুজুর্গানে মুহতারাম, ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ঈমান। ঈমানের সাতটি আরকান বা মৌলিক বিষয় রয়েছে। আর তা হলো–১. আল্লাহর ওপর ঈমান, ২. ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান, ৩. আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান, ৪. নবীগণের প্রতি ঈমান, ৫. কেয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান, ৬. ভালো-মন্দ সব আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয় এবং তা পূর্ব লিপিবদ্ধ–এ বিষয়ের ওপর ঈমান, ৭. মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের ওপর ঈমান।

এই আরকানগুলোকে সংশ্লিষ্ট ব্যাখ্যাসমূহ সহকারে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করা, প্রয়োজনের সময় জীবনের আশঙ্কা না থাকা অবস্থায় মুখে সাক্ষী দেওয়ার নাম ঈমান। এর পাশাপাশি ঈমানের দাবিনামায রোযাসহ সকল শাখা-প্রশাখাতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে প্রকাশ করা, কোরআন নাযিলের পর অন্য সকল ধর্মকে মেয়াদোত্তীর্ণ বাতিল মনে করা এবং ঈমান-আকীদাসংক্রান্ত বিষয়ে কোরআন-হাদীসবহির্ভূত কোনো ব্যাখ্যা না দেওয়াও সহীহ ঈমানের জন্য আবশ্যকীয়। আর এ গুরুত্বপূর্ণ নেয়ামত ঈমানকে দৃঢ় করার পদ্ধতি হলো, ঈমানী দাওয়াত। দাওয়াতের দ্বারা অন্যের ফায়দা হোক চাই না হোক, দাঈ তথা দাওয়াত প্রদানকারীর ফায়দা অবশ্যই হবে।

জানের আশঙ্কা অবস্থায় মুখে ঈমানের স্বীকারোক্তি সম্ভব না হলে সে ক্ষেত্রে তাকে অপারগ গণ্য করা হবে। অনেক সময় হিন্দু বা খ্রিস্টান ব্যক্তি মুসলমান হলে পরিবারের অন্যান্যরা জানলে প্রাণহানির আশঙ্কা থাকে। সে সময় তার দিলের বিশ্বাসটাই নাজাতের জন্য যথেষ্ট হবে। আর অপারগতার মুহূর্তে মৌখিক স্বীকারোক্তির বিষয়টি আল্লাহ তা'আলা তাকে মাফ করে দেবেন, ইনশাআল্লাহ!

প্রাণনাশের আশঙ্কা না থাকলে প্রয়োজনের সময় মুখে ঈমানী স্বীকারোক্তি না দিলে ঈমান থাকবে না। এমনিভাবে ঈমানের শাখা-প্রশাখা তথা আমলসমূহের আবশ্যকতাকে অস্বীকার করলেও ঈমান থাকবে না। অবশ্য স্বীকার করা সত্ত্বেও আমল না করলে তাকে কাফের বলা হবে না। ফাসেক ও গোনাহগার মুসলমান বলা হবে। আল্লাহ তা'আলা মাফ করলে সেই ব্যক্তিও প্রথমবারেই জান্নাতে প্রবেশ করবে। মাফ না করলে অস্থায়ীভাবে দোযখে যাবে তবে ঈমানের বদৌলতে একসময় অবশ্যই জান্নাতে যাবে।

**ঈমানবহির্ভূত বিষয়সমূহ :**

অন্তকরণের বিশ্বাস ও মৌখিকভাবে স্বীকারোক্তির আবশ্যকতা প্রসঙ্গ

ঈমান-আকীদার বিপরীত বিষয় হলো কুফর। কুফরের অনেক প্রকার ও শাখা-প্রশাখা রয়েছে। ঈমানের এ গুরুত্বপূর্ণ নেয়ামতের হেফাজতের স্বার্থে মুমীনের জন্য কুফরের সকল শাখা-প্রশাখা জেনে তা থেকে বেঁচে থাকা জরুরি। অন্যথায় অজ্ঞাতসারে কুফরী কার্যাবলিতে লিপ্ত হয়ে ঈমান ধ্বংস হয়ে যাওয়ার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে।

**মৌলিকভাবে কুফর মোট চার প্রকার :**

এক. কুফরে ইনকার, তথা ঈমানের মৌলিক বিষয় অন্তরে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা এবং মুখে স্বীকার করাকে যে ব্যক্তি অস্বীকার করে। স্বাভাবিকভাবে কাফের বলতে আমরা এমন ব্যক্তিকেই বুঝে থাকি। কাফের লোক দুটির কোনোটিই করে না। ঈমানের আরকানসমূহ অন্তরেও বিশ্বাস করে না, মুখেও স্বীকার করে না। যেমন–হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, ইহুদি, নাস্তিক এবং মুসলমান ছাড়া অন্য সকল ধর্মাবলম্বী। কাফেররা কখনো জান্নাতে প্রবেশ করতে সক্ষম হবে না। জান্নাত তাদের জন্য হারাম করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা সূরা মায়েদার ৭২ নং আয়াতে ইরশাদ করেন,

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সাথে কাউকে শরীক করেছে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন।

দুই. কুফরে নিফাক, তথা অন্তকরণে কাফের কিন্তু বাহ্যিকভাবে মুসলমানের ছদ্মবেশধারী। মুনাফেকরা গনিমত তথা কাফেরদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের যুদ্ধলব্ধ মাল, বায়তুল মালের ভাতা, মুসলিম মেয়ে বিবাহ করা, মসজিদের ইমাম হওয়া, মৃত্যুর পর মুসলমান কবরস্থানে দাফন হওয়া–এজাতীয় মুসলমানদের যাবতীয় সুবিধা গ্রহণ করার জন্য শুধু মুখে মুসলমান হওয়ার দাবি করে কিন্তু অন্তরে ঈমানের আরকানসমূহকে বিশ্বাস করে না। পবিত্র

কোরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা মুনাফেকদের সম্পর্কে বলেন,

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ

আর কতক লোক এমন রয়েছে, যারা বলে যে আমরা আল্লাহর ওপর এবং শেষ দিবসের ওপর ঈমান এনেছি। অথচ তারা মুমিন নয়! (সূরা বাকারা, ৮)

এই আয়াতে কারীমায় অন্তকরণে মুমিন না হওয়ায় মুনাফেকদের মৌখিক ঈমানী স্বীকৃতিকে অগ্রহণযোগ্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

অন্তকরণের বিষয়টি অজ্ঞাত হওয়ার কারণে মুনাফেকরা দুনিয়াতে মুসলমানদের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করলেও কবরে যাওয়ার পর কঠিন আজাবে গ্রেফতার হবে। কারণ কবরে অন্তরের পরীক্ষা হবে। ঈমানের পরীক্ষা হবে। ঈমানের স্থান হলো কলব। তাদের কলব তো ঈমানশূন্য। আল্লাহ তা'আলা মুনাফেকদের সম্পর্কে সূরা নিসার ১৪৫ নং আয়াতে ইরশাদ করেছেন,

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ

নিশ্চয়ই মুনাফেকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে।

জাহান্নামের সাতটি স্তর রয়েছে। যত নিচে যাবে, আজাব তত বেশি হবে। সর্বশেষ স্তরের আজাব সবচেয়ে বেশি। মুনাফেকদের কঠিন আজাব দেওয়ার জন্য সর্বশেষ স্তরেই রাখা হবে। কারণ তারা মুখে মুসলমান হওয়ার দাবি করলেও অন্তরে ঈমানের আরকানসমূহকে বিশ্বাস করে না।

তিন. কুফরে জুহুদ, তথা কোরআন ব্যতীত অন্যান্য আসমানী কিতাবের অনুসারীগণ, যাদেরকে আহলে কিতাব বলা হয়। পূর্ববর্তী উম্মতদেরকেও আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে বিভিন্ন আসমানী কিতাব যেমন–তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল দেওয়া হয়েছিল। তবে উক্ত কিতাব বা আসমানী সংবিধান সুনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত নির্দিষ্ট জাতির জন্য আমলযোগ্য ছিল। ফলে উক্ত কিতাবগুলো এক যমানা পর্যন্ত ঠিক ছিল। যখন নির্ধারিত সময় শেষ হয়ে গিয়েছে, উপরন্তু সর্বজনীন দ্বীন ও শরীয়ত তথা কোরআন নাযিল হলো, তখন পূর্বের সকল কিতাবের বিধানের ওপর আমল করা নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। তা ছাড়া বর্তমানে কেউ চাইলেও উক্ত তাওরাত-ইঞ্জিলের ওপর আমল করতে সক্ষম হবে না। কেননা, বর্তমানের তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল সম্পূর্ণটাই বিকৃত। তাওরাত, যাবুর এবং ইঞ্জিলের সমন্বিত নামে রচিত বর্তমান খ্রিস্টানদের ইঞ্জিল সেন্টপলের বানানো বাইবেল এবং কিছু অজ্ঞাতনামা লেখকের রচনামাত্র। হযরত ঈসা (আ.)-এর ওপর নাযিলকৃত ইঞ্জিল নয়। পবিত্র কোরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা আহলে কিতাবের এই বিকৃতি সম্পর্কে ইরশাদ করেন,

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ(بقره ٧٩)

"সুতরাং ধ্বংস সেই সকল লোকের জন্য, যারা নিজ হাতে কিতাব লেখে তারপর (মানুষকে) বলে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে, যাতে তার মাধ্যমে সামান্য কিছু আয়-রোজগার করতে পারে। সুতরাং তাদের হাত যা রচনা করেছে সে কারণেও তাদের জন্য ধ্বংস এবং তারা যা উপার্জন করেছে, সে কারণেও তাদের জন্য ধ্বংস।" (সূরা বাকারা ৭৯)

প্রকৃত আহলে কিতাবগণের আমাদের নবী সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা ছিল। কারণ তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিলের মধ্যে নবীজি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। নবীজি কোন এলাকায় আগমন করবেন, শারীরিক গঠন কেমন হবে, চেহারা মোবারক কেমন হবে, শরীরের রং কী হবে, কী কী গুণের অধিকারী হবেন, কী ধরনের খাদ্য আহার করবেন, তিনি একই সাথে নবী এবং বাদশাহ হবেন, তাঁকে প্রথমে দেশান্তর করা হবে, পুনরায় দশ হাজারের বাহিনী নিয়ে নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করবেন... ইত্যাকার যাবতীয় বিষয়ের বিশদ বর্ণনা পূর্বের কিতাবসমূহে উল্লেখ ছিল, যার কারণে আহলে কিতাবগণ অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করতে বাধ্য ছিল। কিতাবের এ সকল বর্ণনা উপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না।

অন্তরে থাকা সত্ত্বেও মুখে স্বীকার না করার কারণে আহলে কিতাবগণও কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত। আহলে কিতাবদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা কোরআনে কারীমে সূরা নামলের ১৪ নং আয়াতে ইরশাদ করেন,

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ

তারা অন্যায় ও ঔদ্ধত্যভাবে নিদর্শনগুলো প্রত্যাখ্যান করল যদিও তাদের অন্তর এ বিষয়গুলোকে সত্য বলে গ্রহণ করেছিল।

পবিত্র কোরআনে কারীমে এ কথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে আহলে কিতাবগণ নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে নিজেদের সন্তানের মতো চিনত। (সূরা বাকারা, আয়াত নং-১৪৬)। বরং তাফসীর দ্বারা বোঝা যায় আপন সন্তানাদি থেকেও বেশি চিনত। কারণ সন্তানের ব্যাপারে একটা সন্দেহের অবকাশ রয়েছে যে আল্লাহ না করুক স্বামী বাইরে থাকা অবস্থায় তার বিবি আমানত রক্ষা করেনি, খেয়ানত করেছে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে সন্তান তার বিবির থেকে জন্মগ্রহণ করলেও বাস্তবে সন্তান অন্য কারো। তবে শরীয়তের

নিয়ম অনুযায়ী স্বামী যদি বিচারকের দরবারে গিয়ে এ সন্তানকে অস্বীকার না করে, তাহলে ওই সন্তান স্বামীর ঔরসজাত সন্তান গণ্য হবে। সন্তানের ব্যাপারে কিছুটা সন্দেহের অবকাশ থাকলেও পূর্বেকার কিতাবসমূহে বিস্তারিত বর্ণনার কারণে আহলে কিতাবদের নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সত্য নবী হওয়ার ব্যাপারে কোনোই সন্দেহ ছিল না।

যাহোক কাফের, মুনাফেক এবং আহলে কিতাব–তিন শ্রেণীর লোক ঈমানের গণ্ডি থেকে বাহির হয়ে গেল। অবশ্য আহলে কিতাবদের মধ্য থেকে যারা ঈমান গ্রহণ করেছিলেন, যেমন হযরত আব্দুল্লাহ বিন সালাম (রা.) প্রমুখ সাহাবী তাঁদের কথা ভিন্ন।

চার. কুফরে ইনাদ এবং কোরআন নাযিলের পর অন্য সকল ধর্মকে মেয়াদোত্তীর্ণ বাতিল মনে করা প্রসঙ্গ

এই প্রকারের লোকেরা ঈমানের আরকানসমূহও অন্তরে বিশ্বাস করে, ইসলাম একমাত্র সত্য ধর্ম, এ কথাও স্বীকার করে, কিন্তু কোরআন নাযিলের পর অন্য সকল ধর্ম বাতিল হওয়ার বিষয়টি মানে না। বর্তমান মুসলমানদের বিরাট একটা অংশ উলামায়ে কেরাম এবং দ্বীনদার বুজুর্গদের সোহবত থেকে বঞ্চিত। ধর্মহীন ইংরেজি শিক্ষায় জ্ঞানবান ব্যক্তিদের একটি বৃহৎ শ্রেণী এই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। তাদের ধারণা, অন্য ধর্মাবলম্বীরা যদি ঠিকমতো তাদের ধর্ম পালন করে তাহলে তারাও স্বর্গে যাবে। তারা তাদের ধর্ম পালন করলে দোষের কী আছে?

অনেক ভণ্ড পীরও এ কথা বলে, 'তোমরা যারা মুসলমান তারা মুসলমান থাকো, হিন্দুরা হিন্দু অবস্থায় থাকো, বৌদ্ধরা বৌদ্ধ থাকো–ধর্ম পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই। নিজ নিজ ধর্মে থেকে আমার 'ওযীফা' আদায় করো। তাতেই তোমরা বেহেশতে বা স্বর্গে যেতে পারবে। এ কথা বলার দ্বারা পরোক্ষভাবে ওই পীর অন্যান্য ধর্মকেও সঠিক মানল। কাজেই সেও কাফের হয়ে গেছে। আর যারা তাকে পীর মানছে, তারাও কাফের-বেঈমান হয়ে গেছে। এ সমস্ত কথা না বোঝার কারণে সারা জীবন ইমামের পেছনে প্রথম কাতারে পাগড়ি পরিধান করে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা সত্ত্বেও হাশরের ময়দানে কাফেরদের দলভুক্ত হয়ে ওঠার আশঙ্কা রয়েছে।

যাহোক, ঈমানের আরকানসমূহকে অন্তরে বিশ্বাস করা, মুখে স্বীকার করা এবং কোরআন নাযিলের পর অন্যান্য ধর্মকে বাতিল মনে করা সহীহ ঈমানের জন্য আবশ্যকীয় শর্ত। এই তৃতীয় শর্তটির কারণে হেরাকেল এবং নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর চাচাজান আবু তালেব ঈমানের কাতার থেকে বাহির হয়ে গেছেন। বোখারী শরীফের ৭ নং হাদীসে হেরাকেলের দীর্ঘ ঘটনার বিবরণ এসেছে যে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হেরাকেলের নিকট ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত প্রেরণ করলেন। তখন বায়তুল মোকাদ্দাসে আবু সুফিয়ানের ব্যবসায়ী কাফেলা অবস্থান করছিল। চিঠি পৌঁছার পর হেরাকেল আবু সুফিয়ান থেকে নবীজির বিস্তারিত অবস্থা সম্পর্কে অবগত হলো। হেরাকেল খ্রিস্টীয় ধর্মের আলেম ছিল। নবীজি সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর তার অন্তর সাক্ষ্য দিয়েছিল যে এই ব্যক্তি অবশ্যই সত্য নবী। এরপর চিঠি পড়ে নবীজির দূতকে বলল, إنـي مسـلم আমি মুসলমান হয়ে গেছি। আমি যদি মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পর্যন্ত পৌঁছার ব্যাপারে নিশ্চয়তা পেতাম তাহলে গিয়ে তাঁর পা ধুয়ে দিতাম। কিন্তু আমার কোনো নিশ্চয়তা নেই। আমি তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করলে লোকেরা আমাকে হত্যা করে ফেলবে।

হেরাকেলের এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল ছিল। কেননা নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) চিঠিতে বলেছেন, أسـلـم تسـلـم ইসলাম গ্রহণ করো নিরাপদে থাকবে। এই কথার মধ্যেই ইঙ্গিত ছিল, হেরাকেল ইসলাম গ্রহণ করলে কেউই তাকে ক্ষতি করতে পারবে না; বরং তাকে দেখে তার দেশের অন্যরাও মুসলমান হয়ে যাবে!

হেরাকেলের পুরো ঘটনা নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে শোনানোর পর নবীজি মন্তব্য করলেন, كـذب عـدو الـله ليس بمسلم আল্লাহর দুশমন মিথ্যা বলেছে সে মুসলমান হয়নি।

যাহোক, হেরাকেল অন্তরে বিশ্বাস করেছে, মুখেও স্বীকার করেছে যে إنـي مسـلم আমি মুসলমান হয়ে গেছি। কিন্তু খ্রিস্টান ধর্মকে বাতিল ঘোষণা করে কার্যত ইসলাম আমলযোগ্য মনে না করার কারণে মুসলমান দাবি করার পরও নবীজি তাকে মুমিন-মুসলমান স্বীকৃতি দেননি। (ফাতহুল বারী ১/৩৭-৩৮)

নবীজির চাচা আবু তালেবকে মৃত্যুর সময় নবীজি মুসলমান হওয়ার দাওয়াত দিয়েছিলেন। এ কথাও বলেছিলেন, 'চাচাজান! একবার মাত্র কালেমা পড়ুন তাহলে হাশরের ময়দানে আপনাকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমি আল্লাহ তা'আলার কাছে জোর সুপারিশ করব।' নবীজির এ দাওয়াতের পাশাপাশি আবু জাহেল তাকে বাপ-দাদার ধর্মে অটল থাকার জন্য দাওয়াত দিচ্ছিল। তখন আবু তালেব বলল, ভাতিজা! আমি বিশ্বাস করি,

পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র তোমার ধর্মই সঠিক। মুখে স্বীকারও করি; কিন্তু এই মুহূর্তে তোমার ধর্ম গ্রহণ করলে আরবের মহিলারা আমাকে খোঁটা দেবে যে আবু তালেব মৃত্যুর সময় ভীত হয়ে বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করে ভাতিজার ধর্ম গ্রহণ করেছিল। তা না হলে তোমার ধর্ম গ্রহণ করতে আমার কোনোই দ্বিধা ছিল না। আবু তালেব তখন একটি কবিতাও পড়েছিল,

ولقد علمتُ بأنّ دينَ محمّدٍ
من خير أديانِ البريّة ديناً
لولا الملامة أوَ حذارِ مسبّةٍ
لرأيتنى سمُحاً بذاكَ مبيناً

আমি জানি, মুহাম্মদের ধর্ম পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম। কিন্তু যদি মহিলাদের সমালোচনা আর খোঁটা দেওয়ার আশঙ্কা না থাকত তাহলে ভাতিজা আমি দিল খুলে তোমার ধর্ম গ্রহণ করতাম। (শরহুল আরবাঈন আন নববিয়্যাহ ১/১৬২)

শেষ পর্যন্ত আবু তালেব মহিলাদের সমালোচনার ভয়ে নবীজির দাওয়াত কবুল করেনি; বরং বলল,

اخترت النار على العار

আমি খোঁটা দেওয়ার বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়ে তোমার ধর্ম গ্রহণ না করে আগুনকেই [জাহান্নাম] পছন্দ করলাম। এরপর সে ঈমান কবুল না করে মৃত্যুবরণ করল!

আবু তালেবকে জাহান্নামের মধ্যে সর্বনিম্ন শাস্তি দেওয়া হবে। আগুনের এক জোড়া জুতা পরিধান করানো হবে। এতদ্বসত্ত্বেও আবু তালেব মনে করবে আমাকে সবচেয়ে কঠিন শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। আবু তালেব নবীজিকে অনেক উপকার করেছে কিন্তু ঈমান গ্রহণ না করে মৃত্যুবরণ করার কারণে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ও হাশরের ময়দানে তাকে কোনোই উপকার করতে পারবেন না। কারণ আবু তালেব অন্তরে বিশ্বাস করেছিল, মুখেও স্বীকার করেছিল ঠিকই, কিন্তু অন্য ধর্মকে বাতিল ঘোষণা করেনি। অন্য ধর্মকে বাতিল ঘোষণা না করার এ শর্তের কারণে হেরাকেল এবং আবু তালেবও মুসলমানদের দলভুক্ত হওয়া থেকে বের হয়ে গেল।

**ঈমান-আকীদাসংক্রান্ত বিষয়ে কোরআন-হাদীসবহির্ভূত কোনো ব্যাখ্যা না দেওয়া প্রসঙ্গ**

তো সারকথা হলো, পরিপূর্ণ ঈমানের জন্য অন্তরের বিশ্বাস, মুখের স্বীকারোক্তি, ইসলাম ব্যতীত অন্য সকল ধর্মকে অগ্রহণযোগ্য মনে করে তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া, ঈমানের দাবি আমলসমূহ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা পালন করার সাথে সাথে অন্য আরেকটি শর্ত পাওয়া যাওয়াও অত্যাবশ্যক। সেটা হলো, ঈমান-আকীদাসংক্রান্ত বিষয়ে কোরআন-হাদীসবহির্ভূত কোনো ব্যাখ্যা না দেওয়া। এই শর্ত না পাওয়ার কারণে মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর অনুসারী 'কাদিয়ানীরা' মুসলমানের কাতার থেকে বাদ পড়ে গেছে। তারা ঈমানের আরকানসমূহকে অন্তরে বিশ্বাস করে, মুখেও মুসলমান হওয়ার দাবি করে, অর্থাৎ নিজেদের 'আহমাদী মুসলমান' দাবি করে অন্য ধর্মকেও বাতিল বলে কিন্তু ঈমান-আকীদার বিষয়ে মনগড়া ব্যাখ্যা দেওয়ার কারণে কাফের হয়ে গেছে। আল্লাহ তা'আলা সূরা আহযাবের ৪০ নং আয়াতে ইরশাদ করেন,

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তোমাদের কোনো পুরুষের পিতা নন বরং তিনি আল্লাহ তা'আলার রাসূল এবং সর্বশেষ নবী। এই আয়াতের ব্যাখ্যা নবীজি নিজেই দিয়েছেন যে আমিই শেষ নবী আমার পরে আর কোনো নবী আসবে না। (সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং-২২১৯) অথচ এই আয়াতের একটি শব্দ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ কাদিয়ানীরা এই শব্দের ব্যাখ্যা দিয়েছে 'মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, শেষ নবী নয়।' কাদিয়ানীরা خَاتَمَ النَّبِيِّينَ শব্দের ব্যাখ্যা 'সর্বশ্রেষ্ঠ করার দ্বারা অন্য নবী আসার রাস্তা খুলে দিয়েছে। যে ব্যাখ্যা কোরআন, হাদীস, তাফসীর-কোনো কিছুর দ্বারাই প্রমাণিত নয়। এই কারণে কাদিয়ানীদের অন্তরের বিশ্বাস, মুখের স্বীকারোক্তি, অন্য সব ধর্মকে বাতিল ঘোষণা করা কিছুই কাজে আসেনি। বরং সমস্ত মুফতী তাদের কাফের ফতওয়া দিয়েছেন।

যাহোক, খাঁটি মুসলমানের কাতারে শামিল থাকার জন্য চারটি শর্ত একত্রে পাওয়া আবশ্যক। যথা-

এক. মনে-প্রাণে ঈমানের আরকানসমূহকে সঠিকভাবে বিশ্বাস করা।

দুই. প্রয়োজনের সময় জানের আশঙ্কা না থাকলে মুখে স্বীকার করা।

তিন. কোরআন নাযিল হওয়ার পর অন্য ধর্মকে বাতিল ঘোষণা করা।

চার. ঈমান-আকীদাসংক্রান্ত কোনো বিষয়ের মনগড়া ব্যাখ্যা না দেওয়া।

এই চারটি শর্তের কোনো একটি না পাওয়া গেলে সে শরীয়তের দৃষ্টিতে বেঈমান এবং কাফের বলে গণ্য হবে। তার নামায, রোযা, হজ, যাকাত, মসজিদ বানানো, মাদরাসা বানানো-কোনো আমলই আল্লাহ তা'আলার নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না।

আল্লাহ তা'আলা উক্ত চার শর্তানুযায়ী আমাদের মুমিন-মুসলমান হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

# উভয় জাহানে শান্তি ও মুক্তির পথ

**মূল : মাওলানা মুফতী আবুল কাসেম নুমানী** মুহতামিম দারুল উলূম দেওবন্দ

*ইসলামী সম্মেলন সংস্থা বাংলাদেশের উদ্যোগে চট্টগ্রাম জমিয়তুল ফালাহ ময়দানে অনুষ্ঠিত দুই দিন ব্যাপী ৩৩ আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলনে দ্বিতীয় দিন প্রধান অতিথি হিসেবে প্রদত্ত গুরুত্বপূর্ণ বয়ানের বঙ্গানুবাদ।*

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى اله واصحابه وازواجه واهل بيته وعلينا معهم اجمعين۔

اما بعد: وعن عقبة بن عامر رضى الله تعالى عنه قال ماالنجاة يارسول الله قال املك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك او كما قال رسول الله ﷺ۔

মুহতারাম উলামায়ে কেরাম, বুজুর্গানে দ্বীন, আজীজ তালাবাহ, উপস্থিত সকল ভাই ও বন্ধুগণ। এই আজীমুশশান সম্মেলনে কয়েক বছর থেকে আমি উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছি। হযরত মুফতী আব্দুর রহমান সাহেব (নাওয়্যারাল্লাহু মারকাদাহু)-এর মুহাব্বত আমাকে এখানে টেনে নিয়ে আসে। তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেছেন। কিন্তু তাঁর তৈরি ও পরিচর্যাকৃত বাগানগুলোর ফুল-ফলের খোশবু-উপকার অবিরাম বিস্তৃতি লাভ করছেই। এই সম্মেলনগুলো অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, ঐতিহাসিক এবং অনন্য তাৎপর্যপূর্ণ। অতীতের সম্মেলনগুলোতে আমি কী বলেছি! তা আমার স্মরণ থাকে না। হতে পারে কিছু কথা আপনারা আগেও শুনেছেন। কোনো কথার পুনরাবৃত্তি হলেও কিন্তু তা অবশ্যই উপকারী। কারণ কোরআনের আদেশ হলো :

وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين

অর্থাৎ স্মরণ করিয়ে দিতে থাকুন। কেননা বারবার স্মরণ করার দ্বারা মুমিনগণ উপকৃত হতে থাকে।

স্মরণ করিয়ে দেওয়ার অর্থ হলো, কথার পুনরাবৃত্তি করা। আজকের এই সম্মেলনে আপনাদের সামনে পেশ করার জন্য আমি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর একটি সংক্ষিপ্ত অথচ পরিপূর্ণ অর্থবোধক নসীহত নির্বাচন করেছি।

হযরত উক্ববা বিন আমের একজন সাহাবী। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করেছি, হে আল্লাহর রাসূল! নাজাতের রাস্তা কী? দুনিয়ার বালা-মুসিবত, ধ্বংস, আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টি, আখেরাতের আজাব ইত্যাদি থেকে মুক্তি কোন পথে? এটিই হলো جامع نفع অর্থাৎ পরিপূর্ণ উপকার। সেই পথ কোনটি? যা গ্রহণ করলে উভয় জাহানে সব প্রকারের শান্তি, বালা-মুসিবত এবং সব ধরনের শঙ্কা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে।

এর উত্তরে রাসূল (সা.) তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করেন।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে মহানবী (সা.) কে আল্লাহ তা'আলা অল্প শব্দে অধিক গভীর অর্থবহ ও তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপন করার বিশেষ গুণ দান করেছিলেন।

রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, اوتيت جوامع الكلم আমাকে জামেউল কালেম দান করা হয়েছে, جوامع الكلم অর্থ হলো, এমন বাক্যসমূহ, যার শব্দ হবে কম ও সংক্ষিপ্ত; কিন্তু অর্থ হবে অনেক বেশি, অনেক গুরুত্ব-তাৎপর্যপূর্ণ এবং অনেক গভীর। আমি যে হাদীসটি আপনাদের সামনে পড়েছি তাও جوامع الكلم এর খুবই সুন্দর একটি নমুনা।

এই হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) তিনটি বাক্য উল্লেখ করেছেন। সেখান থেকে প্রথম বাক্যটি হলো,

أملك عليك لسانك

অর্থাৎ জিহ্বাকে সংযত করো।

দুই.

وليسعك بيتك

তোমার ঘর তোমার জন্য প্রশস্ত হোক।

তিন.

وابك على خطيئتك

নিজের ভুল-ত্রুটিগুলো স্মরণ করে অশ্রু ঝরাও, আল্লাহ তা'আলার সামনে কাঁদতে থাকো।

এই তিনটি গুণ যদি নিজেদের মধ্যে এসে যায় তবে আল্লাহ তা'আলার মেহেরবানিতে সর্বপ্রকার বালা-মুসিবত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে, বিপদাপদ থেকে মুক্তি মিলবে। আখেরাতের মঞ্জিলসমূহ সহজ হয়ে যাবে। এই তিনটি বাক্যের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা আপনাদের সামনে তুলে ধরব ইনশাআল্লাহ।

১.

أملك عليك لسانك

স্বীয় জিহ্বাকে সংযত রেখো। যার সংক্ষিপ্ত বাক্য হলো "জবানের

হেফাজত"। এ বিষয়ে রাসূল (সা.) বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং তাগিদ দিয়েছেন যে নিজের জবানের হেফাজত করো।

একটি প্রসিদ্ধ হাদীসে এসেছে যে,

من يضمن لى مابين لحييه ومابين فخذيه اضمن له الجنة

"যে ব্যক্তি দুই চোয়ালের মাঝখানে অবস্থিত (জিহ্বা) এবং দুই উরুর মাঝখানে অবস্থিত (লজ্জাস্থান)-এর গ্যারান্টি দেবে তার জন্য আমি জান্নাতের গ্যারান্টি দেব।"

গ্যারান্টি দেওয়ার অর্থ হলো, এই দুই বস্তুর হেফাজত করা, অপব্যবহার না করা। তা শুধু কথায় নয়, বরং বাস্তবেই এগুলোর হেফাজত এবং সংরক্ষণ করা। অর্থাৎ জিহ্বা দ্বারা কোনো অবৈধ কথা না বলা এবং অবৈধ পন্থায় লজ্জাস্থান দ্বারা যৌন চাহিদা পূরণ না করা। যদি এই দুটি গুণ তার মধ্যে সৃষ্টি হয় এবং এই দুই বস্তুর গোনাহ থেকে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করতে পারে তবে দুনিয়ার আপদ-বিপদ, বালা-মুসিবত, এমনকি অন্যান্য গোনাহ থেকেও রক্ষা পাওয়া যাবে এবং তার জন্য জান্নাতের রাস্তা সহজ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে এক সাহাবী জিজ্ঞেস করেন–

ما اخوف ما تخاف على

আপনি আমার ব্যাপারে কী জিনিস নিয়ে শঙ্কাবোধ করছেন? অর্থাৎ আপনি কোন বস্তুটি আমার জন্য খুবই ক্ষতিকর মনে করেন? তখন উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা.) আরজ করলেন, كف عليك لسانك স্বীয় জবানকে হেফাজত করো। জিহবাকে সংযত করো। জিহবাকে সংযত করতে না পারলে তা হবে তোমার জন্য আজাব ও ধ্বংসের কারণ এবং গোনাহের মাধ্যম। জিহবাকে সংযত করতে পারলে অনেক বিপদাপদ এবং শঙ্কা থেকে মুক্ত থাকতে পারবে। ওই সাহাবী পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন যে اوما نواخذ بما نتكلم وانا المواخذون بما نتكلم؟

হে আল্লাহর রাসূল! যেসব কথা আমাদের মুখ থেকে বের হয় সেগুলো সম্পর্কেও কি আমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে? উত্তরে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, ثكلتك أمك (তুমি তোমার মাতৃহারা সন্তান হও ) তুমি করুণাযোগ্য! তোমার এতটুকুও উপলব্ধি নেই যে,

هل يكب الناس على وجوههم فى النار إلا حصائد السنتهم

'বেশি বেশি ভালো কাজ করে নাও, শুনে রেখো! যাদের রোজ হাশরে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে তারা একমাত্র জিহ্বা দ্বারা সৃষ্ট ক্ষতির কারণেই এর উপযোগী হবে। অর্থাৎ লাগামহীন জবান, অসৎ স্থানে তার ব্যবহারের কারণেই জাহান্নামের উপযোগী হবে।

রাসূল (সা.)-এর এই উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি হলো হযরত সিদ্দীক আকবর (রা.)। যিনি ইসলামের প্রথম খলীফা ছিলেন। এ কথার ওপর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের ইমামগণ একমত। তাঁর নেকীর ভাণ্ডার কত বড় ছিল, সেটি কেউ অনুমান করতে পারবে না। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন, একদা রাসূল (সা.) আরাম করতে ছিলেন। আকাশ খুবই পরিষ্কার ছিল। আকাশের তারাগুলো ছিল খুবই উজ্জ্বল। আমার অন্তরে কোথা থেকে এমন ধারণা জাগ্রত হলো যে আমি রাসূল (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার উম্মতের মধ্যে এমন কোনো ব্যক্তি আছে, যার নেকী আকাশের তারকারাজির সমপরিমাণ হবে? উত্তরে রাসূল (সা.) হ্যাঁ বললেন। হযরত আয়েশা (রা.) ধারণা করছিলেন, রাসূল (সা.) সিদ্দীকে আকবরের নাম বলবেন। কিন্তু রাসূল (সা.) বললেন হযরত উমর (রা.)-এর নাম। রাসূল (সা.) বললেন, 'উমরের নেকী আকাশের নক্ষত্রের সমপরিমাণ। আকাশের নক্ষত্র যেমন গণনা করা যায় না, তেমনি উমর (রা.)-এর নেকীও গণনা করা যায় না।' এই উত্তর শোনার পর রাসূল (সা.)-কে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন ? فأين ابوبكر তাহলে আবু বকরের স্থান কোথায় হবে? অতঃপর রাসূল (সা.) বললেন, হযরত উমরের সব নেকী হযরত আবু বকরের এক নেকীর বরাবর হবে। কত সুউঁচ্চ স্থানের অধিকারী হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.)!

রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, আমার উম্মতের মধ্যে যে কেউ আমার সাথে সদাচরণ করেছে, আমার ওপর এহসান করেছে, আমি তাদের বদলা দুনিয়াতেই আদায় করে দিয়েছি, তবে আবু বকর ব্যতীত। তার প্রতিদান একমাত্র আল্লাহ তা'আলা দিবে।

তিনিই হলেন হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.) যাঁর উপাধিই হলো 'সিদ্দীক'।

সিদ্দীক কাকে বলে? সত্যবাদিতার মর্যাদা কখন-কিভাবে অর্জিত হয়। এ বিষয়ে আমি আপনাদের সামনে কিছু কথা উপস্থাপন করব ইনশাআল্লাহ।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) একদা নিজ জিহ্বা ধরে টেনে টেনে মুখ থেকে বের করার চেষ্টা করছিলেন। এ অবস্থাদৃষ্টে কেউ জিজ্ঞেস করল, আপনি এটা কী করছেন? তখন তিনি বললেন,

ان هذا اوردنى مواردا

এই জিহ্বাই আমাকে বড় ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেবে। বড় আযাবের সম্মুখীন করবে।

আমার ভাই ও বন্ধুগণ। আমরাও সেই গণনার অন্তর্ভুক্ত। জানি না, সকাল

থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কত কথা জিহ্বা থেকে বের হয়। অথচ আমাদের অনুভূতিতেও নেই যে আমরা ভুল কথাবার্তা বললাম, নাকি কল্যাণমূলক ও সহীহ কথা বললাম? ভালো নাকি খারাপ কথা বললাম? আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট হন, এমন কথা বললাম, নাকি আল্লাহ তা'আলা অসন্তুষ্ট হন, এমন কথা বললাম।

হাদীস শরীফের মহাভাণ্ডারের প্রতি নজর ফেরালে দেখা যাবে, এটি একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়। রাসূল (সা.) বিভিন্নভাবে এবং বিভিন্ন উপায়ে এর প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন, জিহ্বাকে সংযত রাখার প্রতি তাগিদ দিয়েছেন।

জবানকে কোন বস্তু থেকে সংযত রাখতে হবে? মুখ দিয়ে কী ধরনের অকল্যাণ ও ভুল কথা বের হয়? এসব বিষয়ে আমাদের চিন্তা করতে হবে। জানতে হবে। অনেক গোনাহ এমন আছে, যেগুলোর সম্পর্ক জিহ্বার সাথে। যেমন–মিথ্যা বলা, গালি দেওয়া, মুখে অনৈতিক বচন-বাক্য ব্যবহার করা, কারো ওপর মিথ্যা অপবাদ দেওয়া, গীবত করা, চোগলখোরী করা, অযথা কসম খাওয়া–এ সবই হলো জবানের গোনাহ। এগুলোর সম্পর্ক হলো জবানের সাথে। রাসূল (সা.) সত্যবাদিতাকে ঈমানের পরিচয় এবং মিথ্যাকে মুনাফিকের আলামত হিসেবে গণ্য করেছেন।

آية المنافق ثلٰث

মুনাফিকের তিনটি পরিচয়।

اذاحدث كذب واذاوعد اخلف واذا ائتمن خان

'কথা বললে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে খেলাফ করে, কোনো আমানত রাখা হলে তার খেয়ানত করে।'

অন্য আরেকটি রেওয়ায়াতে আছে,

اربع من كن فيه كانت خردل من النفاق اذا حدث كذب اذا عهد غادر واذا ائتمن خان واذا خاصم فجر

'চারটি বস্তু এমন আছে, যার মধ্যে এগুলো পাওয়া যাবে তারা সম্পূর্ণরূপে মুনাফিক। যদি তা থেকে কোনো একটি পাওয়া যায় তাহলে তার মধ্যে নেফাকের একটি গুণ আছে, যতক্ষণ না সে এটি ছেড়ে না দেয়। তিনটি তো হলো–১. কথা বললে মিথ্যা বলে, ২. ওয়াদা করলে খেলাফ করে, ৩. কোনো আমানত রাখা হলে তার খেয়ানত করে। চতুর্থ হলো, যদি কারো সাথে তর্ক হয় তবে মন্দ বচন উচ্চারণ করে।' অর্থাৎ খারাপ বাক্য মুখ দিয়ে উচ্চারণ করে, গালাগাল করে ইত্যাদি। নেফাকের উল্লিখিত চারটি আলামতের মধ্যে দুটির সম্পর্ক জিহ্বার সাথে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) নবুওয়াতপ্রাপ্ত হয়েছিলেন ৪০ বছর বয়সে। তিনি যাদের সাথে, যে পরিবেশে শৈশবকাল অতিবাহিত করেছেন তাদের কাছে রাসূল (সা.)-এর উপাধি কী ছিল সেটি আপনারা সবাই জানেন। তাহলো

الصادق الامين

'সত্যবাদী ও আমানতদার।' সুতরাং রাসূল (সা.)-এর ওপর যখন ওহী অবতীর্ণ হলো এবং তাঁকে আদেশ দেওয়া হলো যে وانذر عشيرتك الاقربين আপনি আপনার নিকটবর্তী লোকদের ভীতি প্রদর্শন করুন, তখন তিনি কুরাইশ এবং হাশেম গোত্রের লোকদের সাফা পাহাড়ের চূড়ায় সমবেত করলেন। তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে সবাই একত্রিত হলো। যেহেতু তিনি ছিলেন সবারই মাহবুব, তাদের চোখের মণি। তাদের সামনে দণ্ডায়মান অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা.) সকলকে সম্বোধন করে বললেন, হে লোক সকল! আমি যদি বলি এই পাহাড়ের পাদদেশে দুশমনের একটি দল একত্রিত হয়েছে। ভোর হতেই তারা তোমাদের ওপর হামলা করবে। সচক্ষে দেখা ছাড়া তোমরা কি আমার ওপর আস্থা রেখে নির্দ্বিধায় এই কথা বিশ্বাস করবে? উত্তরে একবাক্যে সবাই বলল,

ما جربنا عليك الاصدقا

'আমরা ইতিপূর্বে আপনাকে কখনো মিথ্যা বলতে দেখিনি।'

৪০ বছরের জীবন কিন্তু সাধারণ বিষয় নয়। সামষ্টিক জীবনে মানুষ ইতিবাচক-নেতিবাচক অনেক কিছুই স্মরণ রাখে। যার ভিত্তিতে পরস্পর ভাঙা-গড়ার অনেক কিছুই ঘটে থাকে। কেউ দূরে সরে যায়। কেউ রাগ হয়। কেউ বা খুশি হয়। এটি সামাজিক বাস্তবতা। কিন্তু রাসূল (সা.) সম্পর্কে পুরো জাতি এই দাবি করছে যে আপনি আমাদের কাছে একজন পরীক্ষিত সত্যবাদী।

কিন্তু কিছু দিন যেতে না যেতে পুরো জাতিই রাসূল (সা.)-এর শত্রুতে পরিণত হয়ে গেল। রাসূলের নবুওয়াতের অস্বীকার করল। তাঁর ওপর অনেক মিথ্যা অপবাদ আরোপ করল। কেউ বলল জাদুকর, কেউ বলল পাগল। তথাপি কেউ এ কথা বলার সাহস করেনি যে তিনি মিথ্যাবাদী। এমন অপবাদ কেউ দিতে পারেনি যে রাসূল (সা.) কোনো সময় কথার বিরূপ কাজ করেছেন।

সততা হলো ঈমানের আলামত, মিথ্যা হলো মুনাফেকীর আলামত। সত্যবাদী লোক কমই পাওয়া যায়।

হাদীস শরীফে আছে, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, 'সিদ্দীক' তথা সত্যবাদী সত্য কথা বলে এবং সর্বদা সত্য কথা বলার চেষ্টা করে। তাঁর নাম আল্লাহ তা'আলার নিকট সিদ্দীক হিসেবে লিখে দেওয়া হয়। আর যদি কেউ মিথ্যা বলে, মিথ্যা বলার সুযোগ তালাশ করে তার

নাম আল্লাহর কাছে মিথ্যাবাদী হিসেবে লিখে দেওয়া হয়।

সিদ্দীকিনের তালিকায় তাঁর নাম লিখে দেওয়ার অর্থ হলো এই, যেমন কোরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে,

الئك الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين۔ وحسن اولئك رفيقا

অর্থাৎ যেই চার প্রকারের লোকদের জন্য আল্লাহ তা'আলার বিশেষ পুরস্কার রয়েছে পবিত্র কোরআনে সেগুলো ধারাবাহিক বর্ণনা করা হয়েছে।

من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين

আম্বিয়ায়ে কেরাম হলেন সবার ওপরে। এরপর হলো সিদ্দীকিনের নাম। যাঁরা প্রতিটি বিষয়ে সত্য। যাঁরা কথায় সত্য, কর্মে সত্য। ওপরেও সত্য, অভ্যন্তরেও সৎ। সত্য-সততাই তাঁদের পরিচয়। তৃতীয় নম্বরে তাঁরা যাঁরা আল্লাহর রাস্তায় প্রাণ উৎসর্গ করে শহীদ হয়ে গেছেন। চতুর্থ নম্বরে হলো সালেহীন। যাঁরা নেক আমল করেন।

এই সিদ্দীক কোনো কাল্পনিক নয়। এটা সম্পূর্ণ বাস্তবতা। কারণ তিনি রাসূল (সা.)-এর সবচেয়ে নিকটবর্তী বন্ধু ছিলেন। এটাই সিদ্দীক হওয়ার প্রমাণ যার মধ্যে সততাই আর সততা।

হযরত সিদ্দীক আকবর (রা.) এমন একক ও অনন্য সিদ্দীকে ছিলেন, যাঁর মধ্যে সৎ-সততা ছাড়া কিছুই ছিল না। একটা কবিতা আছে :

معراج نبی منظور خدا
ہونے کو تھی ہو بھی گئی
پردے میں مگر صدیق کی بھی
تقدیر چمکنے والی تھی

এই কবিতায় একটি ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। যখন রাসূল (সা.) শবে মেরাজের পর কা'বা শরীফে এ কথার ঘোষণা দিলেন যে গত রাত আল্লাহ তা'আলা আমাকে মসজিদে হারাম থেকে নিয়ে মসজিদে আকসা পর্যন্ত সফর করিয়েছেন। মক্কা থেকে গেলাম বায়তুল মুকাদ্দাসে, অতঃপর আকাশে আমার উড্ডয়ন হয়েছে। আবার বায়তুল মুকাদ্দাস এসেছি। অতঃপর সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে মক্কা মুকাররামায় অবতরণ করেছি। এক রাতেই পুরো সফর সম্পাদন করেছেন। তখন রাসূল (সা.)-এর সবচেয়ে বড় শত্রু আবু জাহেল চিন্তা করল যে রাসূলকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার জন্য এটিই বড় সুযোগ। মেরাজের এই খবর তখনো সিদ্দীকে আকবর (রা.)-এর কাছে পৌঁছেনি। আবু জাহেল তাড়াহুড়া করে সিদ্দীকে আকবর (রা.)-এর নিকট গেল। বলল, হে আবুবকর! একটি কথা বলো, 'যদি কোনো ব্যক্তি দাবি করে যে রাত্রে আমি মক্কা থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস গিয়েছি। ফিলিস্তিনে গিয়েছি। অতঃপর রাতারাতি আবার প্রত্যাবর্তন করেছি।' ওই সময় তো বর্তমান যুগের ন্যায় হেলিকপ্টার, বিমান ইত্যাদি ছিল না। বরং উট-ঘোড়া-খচ্চর এবং পায়ে হেঁটে সফর করতে হতো। এত দীর্ঘ সফর স্বল্প সময়ের মধ্যেই কিভাবে সম্ভব? আমি জানতে চাইছি, যদি কোনো ব্যক্তি এমন দাবি করে তাহলে কী হবে? সিদ্দীক আকবর (রা.) বললেন, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আবু জাহেল বলল, যদি এই দাবি স্বয়ং তোমার সঙ্গী, যাকে লোকেরা সত্যবাদী ও আমানতদার মনে করে, অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা.) করে থাকেন তাহলে কেমন হবে? তখন সিদ্দীকে আকবর (রা.) বললেন, যদি তিনি এই দাবি করে থাকেন তবে তা সম্পূর্ণরূপেই সঠিক ও সত্য। সেখানে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই। এতদ শ্রবণে আবু জাহেল হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-কে গালমন্দ করে চলে গেল। অথচ সরাসরি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছ থেকে হযরত আবু বকর (রা.) এই কথা শোনার সুযোগ পাননি। বরং এক শত্রুর মাধ্যমেই খবরটি তাঁর কাছে পৌঁছেছে। অর্থাৎ রাসূল (সা.) বলেছেন, রাত্রে আমি মক্কা থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস পৌঁছেছি, অতঃপর আসমানে। হযরত আবু বকর (র.)-এর উদ্দেশ্য হলো, এই কথাগুলো যদি হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলে থাকেন তাহলে এটি সম্পূর্ণ সঠিক এবং সত্য। তাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। তাঁর ক্ষেত্রে সত্য ছাড়া কিছুই কল্পনা করা যায় না।

আরেকটি ঘটনা। একদা রাসূল (সা.) এক মাহফিলে ওয়াজ করতে গিয়ে পূর্ববর্তী উম্মতের কিছু তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা উল্লেখ করেছেন। রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, একদা জনৈক রাখাল ছাগল চড়াচ্ছিল। এমতাবস্থায় বাঘ এসে একটি ছাগল নিয়ে পালিয়ে গেল। রাখাল বাঘটিকে ধাওয়া দিয়ে ছাগলটিকে উদ্ধার করল। বাঘ বলল, আজ তো তুমি ছাগলটিকে ছিনিয়ে নিয়েছ। যেদিন কোনো রাখাল থাকবে না তখন তুমি কী করবে? এ কথা শুনে সাহাবায়ে কেরাম বললেন,

سبحان الله اذئب يتكلم؟

বাঘও কি কথা বলতে পারে? রাসূল (সা.) ইরশাদ করলেন–

نعم، اومن به انا وابو بكر وعمر

হ্যাঁ, বাঘও কথা বলতে পারে। এর ওপর আমার ঈমান আছে। আবু বকর এবং উমরেরও ঈমান আছে। অথচ এই দুজন উক্ত মজলিসে উপস্থিত ছিলেন না। রাসূল (সা.)-এর এই বাণী সম্পর্কে তাদের জ্ঞাতিও ছিল না। তথাপি রাসূল (সা.) সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে এ কথা যদি আমি তাদের সামনে উল্লেখ করি তখন তারাও অবশ্যই বিশ্বাস করবে।

এরূপ আরেকটি ঘটনা। একদা এক

ব্যক্তি নিজের গরুর ওপর সওয়ার হয়ে যাচ্ছিল। গরু বলে উঠল,

ما لهذا خلقنا وانما خلقنا للحرث

আমাকে সওয়ারের জন্য সৃষ্টি করা হয়নি। আমাকে ক্ষেতে হাল চালানোর জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। তখন সাহাবায়ে কেরাম বললেন,

سبحان الله بقرة تتكلم؟

গরুও কি কথা বলতে পারে? রাসূল (সা.) ইরশাদ করলেন,

نعم أومن به انا وابوبكر وعمرؓ

হ্যাঁ। এর ওপর আমার ঈমান আছে, আবু বকর, উমরেরও ঈমান আছে। অথচ এই মসজলিসে তাঁরা উপস্থিত ছিলেন না। রাসূল (সা.) প্রত্যেক সময়েই তাঁদেরকে (আবু বকর ও উমর) সত্যায়ন করেছেন।

জবান থেকে বাস্তবতার পরিপন্থী কোনো বাক্য নির্গত না হওয়ার নামই সিদ্দীকিয়্যাত তথা সত্যবাদিতা। রাসূল (সা.) বলেন, উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি সদা-সর্বদা সত্য বলার জন্য চেষ্টা করে, সত্য বলতে থাকে, কোনো সময় মিথ্যা কথা না বলে সে আল্লাহর নিকট সত্যবাদী হিসেবেই গণ্য হয়।

ভাই ও বন্ধুগণ! আমাদেরও চেষ্টা করতে হবে। কারণ মিথ্যা হলো অতি নিকৃষ্ট নাপাক বস্তু। হাদীস শরীফে এসেছে, যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলে, ফেরেস্তারা তার মিথ্যার দুর্গন্ধের কারণে অনেক দূরে চলে যায়। মিথ্যা বলার পরিণামে যে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয়, সেটি যদিও আমরা বুঝতে পারি না, আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভকারী পাক-পবিত্র ফেরেস্তাগণ মিথ্যা কথার দুর্গন্ধ অনুভব করে মিথ্যাবাদীর কাছ থেকে দূরে সরে যায়। বোঝা গেল, জবানের ফিতনাসমূহের মধ্যে একটি বড় ফিতনা হলো মিথ্যা।

জবানের অপব্যবহারের মধ্যে আরেকটি হলো গীবত। গীবত এমন একটি ব্যাধি, সাধারণভাবেই সবাই এতে আক্রান্ত। অনেক কম লোকই আছে, যারা এই ব্যাধি থেকে মুক্ত। যদিও সে নেককার সালেহীনদের মজলিসে হোক, আলেমদের মজলিসে হোক অথবা জনসাধারণের মজলিসে হোক। বর্তমানে কারো মজলিসে, কারো মাহফিলে, যদি গীবত করা না হয় তাহলে লোকজন সেটিকে কারামত হিসেবে বর্ণনা করে থাকে। অমুক দ্বীনদার ব্যক্তির মজলিসে কারো কোনো গীবত করা হয়নি।

গীবত মূলত কী? রাসূল (সা.) একদা সাহাবাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জানো গীবত কী? অতঃপর রাসূল (সা.) নিজেই বললেন, তুমি তোমার কোনো মুমিন ভাই সম্পর্কে এমন পন্থায় কোনো কথা বলা, যা সে অপছন্দ করে, কারো অনুপস্থিতিতে তার কোনো এমন কথা বর্ণনা করা, অথবা এমন দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা, যা সে অপছন্দ করে (তা গীবত)। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! যে কথাটি বলা হচ্ছে সেটি যদি সত্য হয় এবং বাস্তব হয়, তখনও কি গীবত হবে? রাসূল (সা.) বললেন, যে দোষ তার মধ্যে আছে সেটি তার অনুপস্থিতিতে বর্ণনা করলে তা হবে গীবত। ওই দোষ না থাকা সত্ত্বেও যদি কারো সম্পর্কে ওই দোষ চর্চা করা হয় তবে তা মিথ্যা রটনার শামিল। বাস্তব দোষ চর্চা হলো গীবত।

গীবত সম্পর্কে কোরআন মাজীদে এসেছে,

ولا يغتب بعضكم بعضا

তোমাদের মধ্যে কেউ কারো গীবত করবে না।

রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন,

ايحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه

তোমাদের মধ্যে কি কেউ নিজ মৃত ভাইয়ের মাংস খেতে পছন্দ করবে? তোমরা সেটি কখনো পছন্দ করবে না। গীবত হলো মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়ার মতোই। গীবত হলো যিনা-ব্যভিচার থেকে মারাত্মক পাপকাজ।

উলামায়ে কেরাম লিখেছেন, গীবত حقوق العباد এর অন্তর্ভুক্ত। যদি গীবতকারী তাওবা করে, আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে তাহলে শুধু তাওবা দ্বারা গীবতের গোনাহ ক্ষমা হয় না। যতক্ষণ পর্যন্ত গীবতকৃত ব্যক্তির কাছ থেকে ক্ষমা নেওয়া না হয়। তাকে বলতে হবে, ভাই আমি আপনার অনুপস্থিতিতে আপনার অমুক দোষ চর্চা করেছি, আমাকে ক্ষমা করে দিন।

গীবতকারীর পরিণাম কী হবে? রাসূল (সা.) একবার সাহাবীদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মাঝে সবচেয়ে গরিব, দীন-দরিদ্র কাকে মনে করো? সাহাবায়ে কেরাম বললেন যার কাছে কোনো টাকা-পয়সা নেই, ধন-সম্পদ নেই। তখন রাসূল (সা.) বললেন আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে গরিব ব্যক্তি হলো ওই ব্যক্তি, যে অনেক নেকী ও সওয়াব সহকারে হাশরের ময়দানে উপস্থিত হবে। যখন হিসাব-নিকাশ শুরু হবে তখন কেউ বলবে, সে আমাকে মেরেছিল। কেউ বলবে সে আমার গীবত করেছিল। কেউ দাবি করবে সে আমার হক্ব নষ্ট করেছিল। এসব দাবি নিশ্চিত সত্য হবে। কারণ এটি এমন স্থান, যেখানে কোনো অযথা দাবি নিয়ে উঠতে পারবে না। যা পাওনা, যতটুকু পাওনা, সত্যি সত্যিই বলতে হবে। মিথ্যা বলার কোনোই অবকাশ থাকবে না। আবার প্রত্যেকের পাওনাগুলো ওই ব্যক্তির নেকী ও সওয়াব দ্বারাই শোধ করা হবে। তখন অন্যের পাওনা শোধ করার একপর্যায়ে ওই ব্যক্তির সমস্ত নেকী নিঃশেষ হয়ে যাবে। তার পরও পাওনাদাররা আসতে থাকবে। তখন

তার কী হবে? তখন পাওনাদারদের গোনাহের বোঝা তার ওপর আরোপিত হবে। গোনাহের বোঝায় সে ধসে পড়বে। একপর্যায়ে হক্বদারদের গোনাহের কারণে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তখন সম্পূর্ণ দীন-দরিদ্র, সবচেয়ে বড় গরিব সেই হবে।

দুনিয়াতে মনে করা হয়, অনেক নেকী আছে। ভালো কাজ আছে। অনেক নফল নামায পড়া হয়েছে, নফল কাজ করা হয়েছে। নফল রোযা রাখা হয়েছে। সদকা-খয়রাত করা হয়েছে। কিন্তু জিহ্বার হেফাজত করা হয়নি। পরচর্চায় লিপ্ত। অন্যের ওপর মিথ্যা রটনায় লিপ্ত। কাউকে কষ্ট দেওয়া হয়েছে। কারো ক্ষতি হয়েছে। হাশরের ময়দানে এসবের বদলা দিতেই সব নেকী শেষ হয়ে যাবে। এর বদলাতে এসব নেকী বিয়োগ হয়ে যাবে। তখন হতে হবে সওয়াব ও নেকীশূন্য দীন-হীন সবচেয়ে বড় গরিব, বড় ফকির।

হযরত মাওলানা যাকারিয়া (রহ.) স্বীয় গ্রন্থে এই হাদীস বর্ণনা করার পর উর্দুতে একটি কবিতা লিখেছেন :

وہ محروم تمنا کیوں نہ سوئے اسمان دیکھے
کہ جو منزل بمنزل اپنی محنت رائگاں دیکھے۔

ভাই ও বন্ধুগণ : এই কারণে নিজের জবানের হেফাজত করুন। গালমন্দ থেকে বেঁচে থাকুন। মিথ্যা বলা থেকে মুক্ত থাকুন। মিথ্যা অপবাদ থেকে বাঁচুন। কারো গীবত করবেন না। জবানকে খুবই সংযত রেখে কথা বলতে হবে। বিশেষভাবে রাগের সময় স্বীয় জিহ্বাকে খুবই সংযত রাখতে হবে। মানুষ রাগান্বিত অবস্থায় অশুদ্ধ ও মন্দ কথা উচ্চারণ করে ফেলে। কখনো কখনো এই কারণে দুনিয়ার জীবনেও বিপদাপদ নেমে আসে। জীবন ধ্বংসাবশেষেও পরিণত হয়। রাগ আর ক্রোধের সময় মানুষ স্ত্রীকে তালাক দেয়। রাগ অবস্থায় গালমন্দ করে। অনেকে মাসআলা জিজ্ঞেস করতে আসেন। মাওলানা সাহেব! আমার স্ত্রী আমাকে এমন এমন কথা বলছে। আমি ক্রুদ্ধ ও রাগ অবস্থায় তাকে তালাক দিয়ে দিয়েছি। মনে রাখবেন, রাগান্বিত অবস্থায় তালাক দিলেও তালাক হয়ে যায়।

প্রশ্ন জাগে, মুহাব্বত করে কেউ কি স্ত্রীকে তালাক দেয়? খুশি হয়ে কেউ কি তালাক দেয়? বরং সে তো ক্রোধের কাছে পরাজিত হয়েই জিহ্বার নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দেয় এবং জিহ্বাকে বিপথগামী করে। রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন,

ليس الشديد بالصرعة انما الشديد الذى يملك نفسه اذا غضب۔

ওই ব্যক্তি প্রকৃত বীর নয়, যে অপরকে আছাড় দিতে পারে। বরং প্রকৃত বীর হলো ওই ব্যক্তি, যে রাগ অবস্থায় নিজের জবানকে সংযত ও নিয়ন্ত্রিত রাখতে পারে।

বোঝা গেল, সবার আগে জিহ্বার অপব্যবহার হয়। এরপর আসে হাত-পায়ের ব্যবহার।

এক হাদীসে আছে, প্রভাতে দেহের প্রতিটি অঙ্গ জিহ্বাকে আবেদন করে :

اتق الله فينا فان استقمت استقمنا وان اعوججت اعوججنا

হে জবান! তুমি আমাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো, কোনো ভুল তরীকায় কাজ করো না। কারণ যদি তুমি ঠিক থাকো তাহলে আমরাও ঠিক থাকতে পারব, যদি তুমি বিগড়ে যাও তাহলে আমাদের জন্য আর কোনো মঙ্গল নেই। কেউ কাউকে বত্রিশ দাঁতের ভেতরে লুকায়িত জবান দ্বারা গালমন্দ করল কিন্তু জুতা পড়বে ডাণ্ডা পড়বে পেটের ওপর, পিঠের ওপর, মাথার ওপর, হাতের ওপর, পায়ের ওপর তাই জবানকে সম্বোধন করে বলা হচ্ছে, তুমি ঠিকঠাক চলো, যদি তুমি ঠিকঠাক চলো তাহলে আমাদের জন্য মঙ্গল হবে। আর যদি তুমি বিগড়ে যাও তাহলে আমাদের জন্য আর কোনো মঙ্গল নেই। এটাই ছিল রাসূলের বাণী।

জবানের অধ্যায়টা হলো অনেক লম্বা এখন সময় স্বল্পতার কারণে সেদিকে যেতে পারব না। কোনো ব্যক্তি সারা জীবন গোনাহ করতেছে সে মারা যাওয়ার সময় একবার لاالہ الا اللہ পড়ে দিয়েছেন তাহলে সারা জীবনের গোনাহগুলো মাফ হয়ে গেল, সে ঈমানের অবস্থায় খাতেমা হয়ে জান্নাতে চলে যাবে لاالہ الا اللہ এর কারণে।

এমন মুসলমান, যিনি সারা জীবন ভালো কাজের মধ্যে কাটিয়েছেন যদি মুখ দিয়ে একবার কুফরী কথা বের করে ফেলেন এবং ওই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন তাঁর জীবনের সকল ভালো কাজ কাজে আসবে না। এ কথা থেকে বুঝতে হবে যে জবানের গুরুত্ব অনেক বেশি। আর একটি কথা বলতে চাই যে রাসূল (সা.) মহিলাদের উদ্দেশ করে বলেন, تصدقن يامعشر النساء فانى رأيتكن اكثر اهل النار (হে মহিলাগণ! তোমরা আল্লাহর রাস্তায় বেশি বেশি করে দান করো। কেননা আমি জাহান্নামের মধ্যে তোমাদের সংখ্যাই বেশি দেখেছি) মহিলারা বললেন হে بم يارسول الله؟ আল্লাহর রাসূল! জাহান্নামের মধ্যে আমাদের সংখ্যা বেশি কেন? তখন রাসূল (সা.) বলেছেন, تكثرن اللعن وتكفرن العشير (তোমাদের মধ্যে দুটি খারাপ কাজ বেশি পাওয়া যায়, ১. তোমরা মুখে বেশি অভিশাপ করো মুখের হেফাজত করো না। ২. তোমরা তোমাদের স্বামীদের অকৃতজ্ঞ হও, মুখের কোনো সীমা থাকে না, সারাক্ষণ চলতে থাকে এবং অকৃতজ্ঞতার সীমা থাকে না।) এ দুটি জিনিস তোমাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। তাই আমাদের জন্য জবানের হেফাজত করা একান্ত প্রয়োজন। হাদীস শরীফে আরেকটি কথা বলা হয়েছে وليسعك بيتك রাসূল (সা.) বলেছেন, তোমাদের বাড়িঘর

তোমাদের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ প্রশস্ত হওয়া চাই। যেটার সার কথা হলো এই, নিজের প্রয়োজনে বাহিরে যেতে পারবে, হোক সেই প্রয়োজন দ্বীনি যেমন–নামাযের জন্য শিক্ষা অর্জন করার জন্য, কিংবা মা-বাবার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য, অথবা সে প্রয়োজন দুনিয়াবী হোক যেমন–ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য বা কোনো জিনিস বাজার থেকে কিনে আনার জন্য তখন তোমরা বাড়ির বাইরে যাইতে পারো। যখনই প্রয়োজন পুরা হয়ে যাবে তখন ঘরে চলে আসো। কেননা বাড়ি হলো তোমাদের জন্য সুরক্ষিত স্থান। যদি বাড়ির ভেতরে থাকো তখন বিপদাপদ থেকে মুক্ত থাকবে, বিশেষ করে পাপ থেকে মুক্ত থাকবে, যদি বাড়ির বাইরে ঘোরাফেরা করতে থাকো চোখের হেফাজত হবে না মানুষের কুদৃষ্টি থেকে বাঁচতে পারবে না। বেগানা মহিলা চোখে পড়বে। অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলতে হবে, কত রকমের মিথ্যা কথা বলতে হবে। এবং মুখ দিয়ে কত খারাপ কথা বলতে হবে। মূল্যবান সময় নষ্ট হবে। এই সমস্ত কারণে নিজের বাড়িকে আল্লাহর নেয়ামত বলে বুঝে নিতে হবে। প্রয়োজনের ক্ষেত্রে বাড়ি থেকে বের হতে পারবে, তাই বাড়িতে এ রকম নিয়ম রাখা দরকার, যার দ্বারা ঘরের মধ্যে বসবাস করে শান্তি পাওয়া যায় যেমন : সকলকে ভালো কাজের তালিম দেবে। ঘরের মধ্যে একে-অপরের খোঁজখবর নেবে, বড়রা ছোটদের স্নেহ করবে। ছোটরা বড়দের সম্মান করবে এবং স্ত্রী স্বামীর কথামতো চলবে। স্বামী স্ত্রীর দেখাশোনা করবে, ছেলে-মেয়ে পিতা-মাতার অবাধ্য হবে না। এ রকম শ্রদ্ধা-ভালোবাসা, স্নেহ-মায়া-মমতা যেই বাড়িতে বা যেই পরিবেশে থাকবে সেই পরিবেশে শান্তি আসবেই। অন্যথায় তার উল্টো হবে।

হাদীসের তৃতীয় বাণী হলো,

وابك على خطيئك

নিজের ভুলত্রুটির জন্য কান্নাকাটি করো। নবীগণ নিষ্পাপ ছিলেন, ফেরেশতারাও সবাই নিষ্পাপ, কিন্তু প্রত্যেক মানুষ গোনাহ করে থাকে কিন্তু গোনাহ করার পর যেই ব্যক্তি আল্লাহর কাছে তাওবা করে সে আবার আল্লাহর প্রিয় বান্দা হিসেবে গণ্য হয়। রাসূল (সা.) বলেছেন,

كلكم خطائون وخير الخطائين التوابون

অর্থাৎ সকল মানুষ গোনাহ করে, গোনাহগারদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো ওই ব্যক্তি, যে সবচেয়ে বেশি তাওবাকারী যেমন : পরিষ্কার কাপড় পরিধানের পর ময়লাযুক্ত হলে আবার পরিষ্কার করে নিই। আবার সতর্কতার সাথে পরিধান করি যাতে ময়লা না লাগে, কিন্তু তার পরও ময়লা লেগে যায়। আবার পরিষ্কার করে নিই। এমন না যে ময়লাযুক্ত হলে পরিষ্কার না করে রেখে দিই, তদ্রূপ মানুষ গোনাহ করার পর তাদের কলব ময়লাযুক্ত হয়ে যায়, তখন তার জন্য অতি প্রয়োজন সে আল্লাহর কাছে তাওবা করে নেবে এবং অধিক পরিমাণ ইস্তেগফার করবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা অতি ক্ষমাশীল। সাহাবায়ে কেরাম রাসূল (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা দৈনিক কতবার তাওবা করব? রাসূল বললেন, ৭০ বার করে তাওবা করো এবং ইস্তেগফার করো। তাওবা এবং ইস্তেগফার থেকে উদ্দেশ্য এই নয় যে মুখে মুখে استغفر الله পড়ে নেওয়া এবং মুখে মুখে তাওবা তাওবা করা এর নাম তাওবা এবং ইস্তেগফার নয়, প্রকৃত পক্ষে তাওবা হলো নিজের কৃত পাপসমূহের ওপর লজ্জিত হওয়া। গোনাহকে গোনাহ মনে করে আল্লাহর কাছে স্বীকার করা এবং মুখে এই কথা বলা–হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দিন এবং এই কথা বলা যে আমি আগামীতে এই গোনাহ আর করব না। রাসূল (সা.) শেষবারের মতো উপদেশ দিলেন যে তোমরা নিজের কৃত পাপসমূহের ওপর ক্ষমা চাইতে থাকো, যথাসম্ভব গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করো, গোনাহ লজ্জাজনক কাজ। কিন্তু মানুষ দুর্বল হওয়ার কারণে বাঁচতে চাইলেও বাঁচতে পারে না। এবং সবচেয়ে বড় পাপ হলো গোনাহের ওপর অটল থাকা এবং তাওবা করে মোছার চেষ্টা না করা। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, যেই মানুষ গোনাহ করার পর বলে যে, رب اذنبت فاغفرلى হে আল্লাহ! আমি গোনাহ করেছি, আমাকে ক্ষমা করে দিন। তখন আল্লাহ তা'আলা ফেরেস্তাদের মাঝে বলেন ان عبدى يعلم ان له ربا يغفر الذنوب আবার গোনাহ করে আবার বলে رب اغفرلى হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দিন। তখন আল্লাহ তা'আলা ফেরেস্তাদের মাঝে বলেন, আমার বান্দার দৃঢ় বিশ্বাস যে তার এমন প্রভু আছেন, যিনি তার গোনাহকে ক্ষমা করে দেবেন। সুতরাং আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম। তেমনিভাবে যদি ৭০ বার গোনাহ করে ৭০ বার তাওবা করে ৭০ বারই আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দেন। সুতরাং আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি আমাদের তাঁর কাছে কান্নাকাটি করার যোগ্যতা দান করেন এবং আজীবন গোনাহ থেকে সত্যিকারে তাওবা করে অশ্রু ফেলার তাওফীক দান করেন। কেননা আল্লাহ তা'আলার কাছে দুটি ফোঁটার অনেক মূল্য। একটি হলো শহীদের রক্তের ফোঁটা। আরেকটি হলো আল্লাহ তা'আলার কাছে লজ্জিত হয়ে ঝড়ানো অশ্রুর ফোঁটা।

وماتوفيقى الا با الله

**ভাষান্তর : কারী জসিমুদ্দীন কাসেমী**

# মুবাল্লিগ ভাইদের প্রতি হযরতজির হেদায়াত-৩

মুফতী শরীফুল আজম

*(সেপ্টেম্বর ২০১৬ এর পর)*

**পীর-মাশায়েখের সোহবত :**

যে পথ ধরে ঈমানকে নিচু স্তর থেকে উঁচু স্তরে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। যে পন্থা অবলম্বন করে ঈমানের স্তরসমূহ হাসিল করে খাঁটি বান্দা হিসেবে নিজেকে প্রস্তুত করা সম্ভব। ঈমানী তারাক্কীর এমন পথ ও পন্থা আসলে কোনটি? এ ব্যাপারে দাওয়াত ও তাবলীগের পথিকৃৎ হযরতজি শাহ মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)-এর মালফুজাত থেকে আমরা কিছু দিকনির্দেশনা পেতে পারি।

হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)-এর ভাষ্য মতে, দাওয়াত ও তাবলীগের প্রচলিত মেহনতের মূল উদ্দেশ্য যদিও ঈমান আমলে পূর্ণাঙ্গতা অর্জন; কিন্তু এর মাঝে যে সকল আমল চালু করা হয়েছে যেমন–তিন দিন, চিল্লা, তিন চিল্লা, গাশত, মোলাকাত ইত্যাদি এগুলোকে মূল লক্ষ্যে পৌঁছার প্রাথমিক ধাপ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। আর সফলতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছতে হক্কানী উলামা-মাশায়েখের দ্বারস্থ হয়ে তাদের সোহবতের মাধ্যমে চেষ্টা করে যাওয়ার হেদায়াত প্রদান করা হয়েছে। হযরতজি মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) বলেন,

*ہماری اس تحریک کا اصل مقصد ہے مسلمانوں کو جمیع ماجاء بہ النبی ﷺ سکھانا (یعنی اسلام کے پورے علمی وعملی نظام سے وابستہ کردینا) یہ تو ہے ہمارا اصل مقصد رہی قافلوں کی یہ چلت پھرت اور تبلیغی گشت سو یہ اس مقصد کے لیے ابتدائی ذریعہ ہے اور کلمہ ونماز کی تلقین وتعلیم گویا ہمارے پورے نصاب کی الف، ب، ت ہے، یہ بھی ظاہر ہے کہ ہمارے قافلے پورا کام نہیں کرسکتے ان سے تو بس اتنا ہی ہوسکتا ہے تو ہر جگہ پہنچ کر اپنی جدوجہد سے ایک حرکت و بیداری پیدا کردیں اور غافلوں کو متوجہ کرکے وہاں کے مقامی اہل دین سے وابستہ کرنے کی اور اس جگہ کے دین کی فکر کرنے والوں (علماء وصلحاء) کو بیچارے عوام کی اصلاح پر لگادینے کی کوشش کریں۔*

আমাদের এই মেহনতের মূল লক্ষ্য হচ্ছে, মুসলমানদের নবীজি (সা.) আনীত পূর্ণাঙ্গ দ্বীন শিক্ষা দেওয়া। এটা হলো আসল উদ্দেশ্য। আর কাফেলার এই চলাফেরা এবং তাবলীগি গাশত ইত্যাদি হচ্ছে ওই লক্ষ্যে পৌঁছার প্রাথমিক মাধ্যম মাত্র। অনুরূপ কালেমা এবং নামাযের তালকীন ও প্রশিক্ষণ যেন আমাদের পূর্ণাঙ্গ সিলেবাসের মাঝে অ, আ, ই-এর মতো আদর্শলিপি পাঠতুল্য। এটাও স্পষ্ট যে আমাদের কাফেলা পুরা কাম আঞ্জাম দিতে পারবে না। তাদের পক্ষে শুধু এতটুকু সম্ভব হবে যে প্রত্যেক এলাকায় গিয়ে চেষ্টা-মেহনত করে একটি জাগরণ সৃষ্টি করে দেবে এবং গাফেলদের সজাগ করে এলাকার আহলে দ্বীনদের সাথে সম্পৃক্ত করে দেওয়া এবং দ্বীনের ফিকির করণেওয়ালা উলামা-মাশায়েখদের বেচারা সাধারণ মুসলমানদের ইসলাহে আত্মনিয়োগ করার চেষ্টা করে যাবে। (মালফুজাত, পৃ-২৯)

হযরতজি (রহ.)-এর এ কথা থেকে এটা স্পষ্ট ফুটে ওঠে যে এই মেহনতের মাধ্যমে সর্বসাধারণের মাঝে ঈমানী চেতনা জাগ্রত করে তাদের পূর্ণ দ্বীন আর ঈমান শিক্ষার জন্য উলামা-মাশায়েখের সাথে জুড়ে দেওয়াই উদ্দেশ্য। এই মেহনত আদর্শলিপি পাঠের মতো। বিএ অথবা এমএ পাস করার জন্য প্রাথমিক স্তর হচ্ছে আদর্শলিপি পাঠ করা। কিন্তু আদর্শলিপির চর্চা নিয়েই যদি কেহ আজীবন পড়ে থাকে তবে তার পক্ষে এমএ পাস করা সম্ভব হবে না। হ্যাঁ, সে নিরক্ষরতার স্তর অবশ্য পার হতে পারে। অনুরূপ হযরতজি (রহ.) প্রণিত সিলেবাসের মাঝে মাশওয়ারা চিল্লা আর গাশত ইত্যাদি করে যে ক্ষান্ত হবে উলামা-মাশায়েখের সোহবতে যাবে না, তার ঈমান ও প্রাথমিক স্তর পার হবে ঠিক, তবে উঁচু স্তরে পৌঁছা তার জন্য দুষ্কর হবে।

**উলামা-মাশায়েখের দৃষ্টি আকর্ষণ**

উলামা-মাশায়েখের সোহবত ছাড়া শুধু তাবলীগ জামা'আতের কর্মসূচি পালন করে ঈমানের উঁচু স্তর অর্জন সম্ভব হবে না। বিষয়টি আরো পরিষ্কার বুঝে আসে হযরতজি মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)-এর একটি আহবান থেকে। তিনি উলামা-মাশায়েখের উদ্দেশে বলেন,

*علماء سے کہنا ہے کہ ان تبلیغی جماعتوں کی چلت پھرت اور محنت وکوشش سے عوام میں دین کی صرف طلب اور قدر ہی پیدا کی جاسکتی ہے اور ان کو دین سیکھنے پر آمادہ ہی کیا جاسکتا ہے آگے دین کی تعلیم وتربیت کا کام علماء وصلحاء کی توجہ فرمائی ہی سے ہوسکتا ہے اس لیے آپ حضرت کی توجہات کی بڑی ضرورت ہے۔*

উলামায়ে কেরামদের বলতে চাই যে তাবলীগ জামা'আতের এই চলাফেরা আর চেষ্টা মোজাহাদার ফলে সর্বসাধারণের মাঝে দ্বীনের তলব এবং এর কদর শুধু সৃষ্টি করা সম্ভব। এর দ্বারা তাদেরকে দ্বীন শিখতে উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে। এরপর দ্বীনের তা'লীম-তারবিয়াত এবং শিক্ষা-দীক্ষার কাজ উলামা-মাশায়েখের প্রচেষ্টার মাধ্যমেই কেবল সম্ভব হতে পারে। তাই এদিকে আপনাদের দৃষ্টি দেওয়া অতীব

জরুরি। (মালফুজাত-১৪২)

অতএব দাওয়াতের এই মুবারক মেহনতের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বুঝে আসতে হবে। এর পরিধি ও কার্যকারিতা কতটুকু তা জেনে পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে হবে। উলামা-মাশায়েখের কাছে সর্বসাধারণের দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া শুধু তাবলীগ করে করে পরিপূর্ণ দ্বীন শেখা, ঈমান শেখা যে সম্ভব হবে না, এটা হযরতজির কথা থেকে স্পষ্ট। হযরতজি মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)-এর তাবলীগ আর উলামা-মাশায়েখের তা'লীম ও তারবিয়াতের সমন্বয়ে কেবল মুসলমানদের দ্বীন ও ঈমানের হেফাজত ও তারাক্কী সম্ভব হবে, অন্যথায় নয়। হযরতজি মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)-এর সমকালীন উলামা-মাশায়েখগণ দাওয়াতের এই মেহনতকে এভাবেই জেনেছেন ও বুঝেছেন। হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.)-এর তামান্নাও তাই ছিল। তিনি বলতেন মাওলানা ইলিয়াসের তাবলীগ আর উলামাদের তারবিয়াত–এই দুইয়ের সমন্বয়ে মানুষের দ্বীন পূর্ণতা লাভ করতে পারে।

**কর্মী বানানো উদ্দেশ্য নয়**

দাওয়াতের মেহনতের ফলে একজন সাধারণ মুসলমানের মাঝে দ্বীনের যে পিপাসা তৈরি হয়, তা নিবারণের জন্য উলামা-মাশায়েখের সোহবত আবশ্যক। এ ছাড়া তার ঈমানকে পূর্ণতায় পৌঁছানো সম্ভব নয়। প্রত্যেক মুবাল্লিগ ভাইয়ের একান্ত কর্তব্য হচ্ছে কোনো শায়খে কামেলের দ্বারস্থ হওয়া। তাঁর সোহবতে থেকে নিজের দ্বীন-ঈমানকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করা। জিম্মাদারগণ তার মামুরদের এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করতে হবে এবং এর মুহাসাবা ও কারগুজারী শুনতে হবে। তাবলীগের ছোট-বড় বিভিন্ন মাশওয়ারা বা জোড়ে যেভাবে কারগুজারী শোনা হয় যে কতজন আলেম কাজের সাথে জুড়ালেন বা কতজন শবগুজারীতে উপস্থিত হলেন ইত্যাদি। অনুরূপ কতজন তাবলীগের সাথি উলামা-মাশায়েখের সোহবতে গেলেন, কতজন শায়খে কামেলের দ্বারস্থ হলেন এবং সেখান থেকে দ্বীনের কোন কোন বিষয় হাসিল করলেন–এ বিষয়ে কারগুজারী শোনাও একান্ত প্রয়োজন। প্রত্যেক হালকাতে কতজন সালওয়ালা এবং চিল্লাওয়ালা আলেম রয়েছেন এর হিসাব যেভাবে ছক কষে করা হয় তদ্রূপ কতজন মুবাল্লিগ ভাই শায়খে কামেলের সোহবত এখতিয়ার করলেন এবং মাসায়েলে ইলম শেখার জন্য হক্কানী আলেমের দ্বারস্থ হলেন এর হিসাবও রাখা চাই। যদি তা করা হয় তবে মুবাল্লিগ ভাইগণ এর প্রয়োজন অনুধাবনে সক্ষম হবেন। এর প্রতি উদ্বুদ্ধ হবেন ফলে তাঁদের ঈমানী তারাক্কীর পথ মসৃণ হবে। অন্যথায় তাঁদের মাঝে শুধু আলেমদের কাজে লাগানোর মেজাজ পয়দা হবে। তাঁদের সোহবত থেকে ফায়দা উঠানোর আবশ্যকতা বুঝে আসবে না। আর বাস্তব পরিস্থিতিও সে দিকেই মোড় নিচ্ছে বলে মনে হয়। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে এ ব্যাপারে দু-একটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে।

আমাদের সবগুজারী পয়েন্ট হচ্ছে টঙ্গী ইজতেমা ময়দানের টিনশেড মসজিদ। একবার সবগুজারীতে গিয়ে মাওলানা ..... সাহেবের বয়ান শুনে থ খেয়ে গেলাম। দাওয়াতের এই মুবারক মেহনত যাঁদের কোরবানীর বদৌলতে আল্লাহ তা'আলার দরবারে কবুল হয়েছে সেই হযরতজির কথার সাথে উনার বয়ানের কোনো মিল নেই। বয়ানের সার কথা হলো, তাবলীগি সফরই হলো ইলম অর্জনের আসল পদ্ধতি। আলেম-উলামাদের দ্বারস্থ হওয়ার প্রয়োজন নেই। আর তাযকিয়ায়ে নফসের জন্য সুন্নাতের ওপর আমলই যথেষ্ট। সুন্নাত মতে পানাহার করলে, সুন্নাত মতে ঘুমালে তাযকিয়া হাসেল হয়ে যাবে। শায়খে কামেলের সোহবতের প্রয়োজন হবে না। আমবয়ানের পরে পশ্চিমের কামরায় উলামায়ে কেরামের খাস বয়ান ছিল। সেখানে গিয়ে ওই মাওলানা সাহেবের সাথে কথা বলার সুযোগ হলো। কাকরাইল মারকাযের তিনি স্বনামধন্য উস্তাদ এবং কাজের জিম্মাদার। (প্রকাশ থাকে যে পরবর্তীতে তাহকীক করে জানা যায় তিনি কাকরাইলের উস্তাদ নন, এমনকি দাওরা পাস আলেমও নন। দীর্ঘদিন মুফতী নাম ধারণ করে কাকরাইলে বসে মানুষদের বিভ্রান্ত করছেন।) একটি ফতওয়া প্রসঙ্গে তিনি কয়েকবার বসুন্ধরায় এসেছিলেন এবং বড় হুজুর (রহ.)-এর সাথে সে বিষয়ে বিস্তারিত কথা হয়েছিল। মূলত সেই সুবাদেই তাঁর সাথে আমার পরিচয়। উলামায়ে কেরামের খাস মজলিসে তিনি বিভিন্ন আলেমদের সাথে মতবিনিময় করছিলেন। সুযোগ বুঝে আমি বয়ানের প্রসঙ্গ তুললাম। বললাম, তাযকিয়া শব্দের দাবি হচ্ছে এখানে একজন মুযাক্কি লাগবে। আপনি যে বললেন সুন্নাতের ওপর আমল করলেই তাযকিয়া হয়ে যাবে। তাহলে বিষয়টি কেমন হলো? তিনি বললেন, হ্যাঁ, وكونوا مع الصادقين এবং সত্যবাদীদের সাথে থাকো। এ আয়াতের দ্বারা এটাই বোঝা যায় যে তাযকিয়ার জন্য শায়খে কামেলের সোহবত লাগবে। আমি নিজেও মাওলানা সা'দ সাহেবের হাতে বাইয়াত হয়েছি। আমি বললাম যে আপনি নিজে শায়েখের সোহবত অবলম্বন করলেন আর বয়ানে বললেন এর প্রয়োজন নেই। এভাবে তো সাধারণ মুবাল্লিগ ভাইয়েরা বিভ্রান্ত হবে। তিনি বললেন, শায়খের সোহবতে পাঠালে দাওয়াতের মেহনত ছেড়ে দেওয়ার ভয় থাকে। আমি বললাম যে শায়খের কাছে গেলে এমন ভয় থাকে না তার কাছে তো যেতে পারে। মূলত মিম্বর থেকে জিম্মাদার উলামাদের এমন মনগড়া বয়ান শুনে সাধারণ সাথিরা

বিভ্রান্ত হচ্ছে। শায়খে কামেলের সোহবতকে তারা দাওয়াতের কাজের অন্তরায় ভাবছে।

একবার আমাদের মহল্লা থেকে এক চিল্লার জামা'আত গেল নওগাঁ জেলার একটি ইউনিয়নে। জামা'আতের নুসরতে মহল্লার এক সাথিসহ আমরা দুজন সেখানে গেলাম। সাথিদের নিয়ে ছয় সিফাতের মুযাকারা শুরু হলো। আমি খুব উদ্বেগের সাথে লক্ষ করলাম যিকিরের সিফাতে গিয়ে হাসিল করার তরীকা বলার সময় হক্কানী পীর-মাশায়েখের অজিফা থাকলে তা আদায় করি–কথাটি বাদ দেওয়া হচ্ছে। অথচ যিকির হাসিল করার তরীকার মাঝে সকাল-বিকাল তিন তাসবিহ আদায়, জায়গায় জায়গায় মাসনূন দু'আসমূহ আদায় এবং হক্কানী পীর-মাশায়েখের অজিফা আদায় সমান গুরুত্বের সাথে বলা হতো। হঠাৎ এ পরিবর্তন দেখে আমি বিষয়টি বাদ দেওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলে জামা'আতের আমির সাহেব (যিনি বহু পুরাতন সাথি) বললেন, পীর-মাশায়েখের কাছে গেলে সাথি ছুটে যায়। আমি বললাম, যার কাছে গেলে মেহনতে ভাটা পড়ে না–এমন শায়খ বাছাই করা দরকার। সাধ্যমতে বোঝানোর চেষ্টা করলাম। সাথিরা সবাই ছয় সিফাতের মুযাকারা বন্ধ করে কথাগুলো শুনলেন এবং সঠিক বিষয় জানতে পেরে খুশি হলেন।

সাথি ছুটে যাওয়ার ভয়ে শায়খে কামেলের সোহবত বিসর্জনের ফর্মুলা কতটুকু গ্রহণযোগ্য তার সিদ্ধান্ত এখনই নিতে হবে। তাবলীগ জামা'আতের মেহনতের উদ্দেশ্যই তো হচ্ছে প্রতিটি মানুষকে পূর্ণাঙ্গ ঈমানদার বানানো। যার প্রাথমিক প্রচেষ্টা হচ্ছে তাবলীগ। এখন যদি তাবলীগে গিয়ে কারো মাঝে দ্বীনের পিপাসা জাগে আর সে কোন শায়খে কামেলের সোহবত এখতিয়ার করে তবে সেখানে আপত্তি থাকার প্রশ্নই আসে না। কত চিল্লা তিন চিল্লার সাথি কাজ থেকে শুধু সরেই যায় না বরং দ্বীন থেকেও সরে যায়, এদের নিয়ে অত ভয় নেই, যত ভয় কোনো সাথি শায়খের সোহবতে গমন করলে হয়ে থাকে। এ ভয় অযাচিত, অগ্রহণযোগ্য। কাজের সাথে মহব্বত রাখে, এমন শায়খ নির্বাচন করা হলে ব্যক্তিজীবনে দ্বীন-ঈমানের তারাক্কীর সাথে সাথে কাজেরও অগ্রগতি হবে। দাওয়াতের এই মোবারক মেহনত কোনো সংগঠন নয় যে কর্মী তৈরি ও কর্মী ধরে রাখার মানসিকতা নিয়ে কাজ করতে হবে। সাথিদের নিছক পাঁচ কাজের কর্মী না বানিয়ে বরং প্রত্যেক ফরদকে পূর্ণ দ্বীনদার এবং পূর্ণ ঈমানদার বানানোই এই মেহনতের উদ্দেশ্য, যা উলামা-মাশায়েখের সোহবত ছাড়া সম্ভব নয়। (মালফুজাত, পৃ-৩৬)

**সোহবতের গুরুত্ব ও মহত্ত্ব**

দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতের শুরুলগ্ন থেকে যিনি এর পৃষ্ঠপোষকতা করে আসছেন তিনি হচ্ছেন শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্দলভী (রহ.)। যিনি একদিকে ছিলেন খানকাহী জিন্দেগীর ধারক ও বাহক, অন্যদিকে ছিলেন তাবলীগের পৃষ্ঠপোষক। তাঁর লেখা ফাজায়েলের কিতাব আজ সারা বিশ্বে পবিত্র কোরআনের পর সর্বাধিক পঠিত কিতাব হিসেবে স্বীকৃত। ফাজায়েলে তাবলীগের সপ্তম পরিচ্ছদে তিনি অত্যন্ত জোরালোভাবে মুবাল্লিগ ভাইদের প্রতি দরখাস্ত করেছেন, তারা যেন কোনো আল্লাহওয়ালার সাথে সম্পর্ক করে। তাঁর সোহবতে যাতায়াত করে। হযরত শায়খ (রহ.) বলেন,

*بالجملہ اس تحقیق کے بعد کہ یہ شخص اللہ والوں میں سے ہے اس کے ساتھ ربط کا بڑھانا اسکی خدمت میں کثرت سے حاضر ہونا اس کے علوم سے منتفع ہونا دین کی ترقی کا سبب ہے اور نبی کریم ﷺ کا امر بھی ہے*

মোট কথা, তাহকীক করে সুন্নাতের অনুসারী আল্লাহওয়ালার সন্ধান পাওয়ার পর তাঁর সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি, তাঁর খিদমতে বেশি বেশি হাজির হওয়া, তাঁর ইলম থেকে উপকৃত হওয়া দ্বীনি তারাক্কী ও অগ্রগতির কারণ এবং নবীজি (সা.)-এর নির্দেশও বটে।

এরপর তিনি পবিত্র কোরআনের একটি আয়াত উল্লেখ করে বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সাথে থাকো। (সূরা আত্ তাওবাহ-১১৯)

মুফাসসিরগণ লিখেছেন, সত্যবাদী বলতে এখানে মাশায়েখে সুফিদের বোঝানো হয়েছে। যখন কোনো ব্যক্তি তাঁহাদের খাদেম হয়ে যায় তখন তাঁহাদের তারবিয়াত ও বুজুর্গীর বদৌলতে সে উন্নতির উঁচ্চ শিখরে পৌঁছে যায়। শায়খে আকবার (রহ.) লিখেছেন, যদি তোমার কাজকর্ম অপরের ইচ্ছার অধীন না হয়, তবে তুমি সারা জীবন সাধনা করেও মনের খাহেশাত হইতে ফিরতে পারবে না। অতএব, যখনই তুমি এমন ব্যক্তি পেয়ে যাও, যাঁহার প্রতি তোমার অন্তরে ভক্তি-শ্রদ্ধা হয়, তখনই তাঁহার খিদমতে লেগে যাও। তাঁহার সম্মুখে তুমি মুর্দার মতো হয়ে থাকো, যাহাতে তিনি তোমার ব্যাপারে যাহা ইচ্ছা তাহাই করতে পারেন এবং তোমার ইচ্ছা বলতে যেন কিছুই অবশিষ্ট না থাকে। তাঁহার হুকুম পালনে জলদি করো, তিনি যে জিনিস হতে নিষেধ করেন উহা হতে বিরত থাকো, তিনি যদি পেশা গ্রহণ করতে হুকুম করেন তবে গ্রহণ করো; কিন্তু ইহা তাঁহার হুকুমের কারণে গ্রহণ করো; তোমার পছন্দের কারণে নয়, তিনি বসতে হুকুম করলে বসে পড়ো। অতএব ইহা অত্যন্ত জরুরি যে কামেল শায়েখ তালাশ করতে তুমি সচেষ্ট হও। তা হলেই তিনি তোমাকে আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছে দেবেন। (ফাজায়েলে তাবলীগ সপ্তম পরিচ্ছেদ)

*(চলবে ইনশাআল্লাহ)*

# সব জাতির জন্য কি নবী এসেছেন?

মাওলানা শরীফ উসমানী

মহান আল্লাহ হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে হযরত মুহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত যুগে যুগে, দেশে দেশে অগণিত নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। নবী-রাসূলরা পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি। পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলার বিধিবিধান বাস্তবায়ন করাই নবী-রাসূলদের কাজ। নবী-রাসূলদের আনুগত্য মূলত আল্লাহরই আনুগত্য। নবী-রাসূলদের প্রধান কাজ হলো, সত্য ও ন্যায়ের দিকে আহবান। নবী-রাসূলরা মানুষকে নির্ভুল ও ওহিপ্রদত্ত জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন।

নবী-রাসূলদের সংখ্যা নিয়ে মতভেদ আছে। হযরত আবু যর গিফারী (রা.) থেকে বর্ণিত। আমি একবার জিজ্ঞেস করলাম, 'হে আল্লাহর রাসূল! নবী-রাসূলদের সংখ্যা কত? তিনি প্রত্যুত্তরে বলেন, নবী হলেন এক লাখ চব্বিশ হাজার, আর রাসূল হলেন ৩১৩ জন।' (তাফসীরে কুরতুবী, ষষ্ঠ খণ্ড, ১৫ পৃষ্ঠা)

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'আমি আট হাজার নবীর নিদর্শনের ওপর প্রেরিত হয়েছি, তন্মধ্যে চার হাজার বনি ইসরায়েল গোত্র থেকে এসেছেন।'

কা'ব আল আহবার বলেন, নবী-রাসূলের সংখ্যা দুই কোটি দুই লাখ। মাকাতিল (রহ.) বলেন, নবী-রাসূল মোট এক কোটি চার লাখ ২৪ হাজার। (তাফসীরে কুরতুবী, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৫)

প্রকৃতপক্ষে নবী-রাসূলদের সঠিক সংখ্যা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন। পবিত্র কোরআন মজীদে মাত্র ২৫ জন নবী-রাসূলের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁরা হলেন–১. হযরত আদম (আ.), তাঁর জীবনকাল ৯৬০ বছর। ২. হযরত ইদরিস (আ.), ৩৫০ বছরের সময় তাঁকে আকাশে উঠিয়ে নেওয়া হয়। ৩. হযরত নূহ (আ.), তাঁর জীবনকাল এক হাজার বছর। ৪. হযরত হুদ (আ.)। ৫. হযরত সালেহ (আ.), তাঁর জীবনকাল ৫৮ বছর। ৬. হযরত ইবরাহিম (আ.), তাঁর জীবনকাল ৫৭৫ বছর। ৭. হযরত লুত (আ.)। ৮. হযরত ইসমাঈল (আ.)। ৯. হযরত ইসহাক (আ.), তাঁর জীবনকাল ১৮০ বছর। ১০. হযরত ইয়াকুব (আ.), তাঁর জীবনকাল ১৪৭ বছর। ১১. হযরত ইউসুফ (আ.), তাঁর জীবনকাল ১২০ বছর। ১২. হযরত আইয়ুব (আ.), তাঁর জীবনকাল ৯৩ বছর। ১৩. হযরত শুয়াইব (আ.)। ১৪. হযরত মুসা (আ.), তাঁর জীবনকাল ১২০ বছর। ১৫. হযরত হারুন (আ.)। ১৬. হযরত ইউনুস (আ.)। ১৭. হযরত দাউদ (আ.), তাঁর ১০০ বছর। রাজ্য পরিচালনা করেন ৪০ বছর, ১৮. হযরত সুলাইমান (আ.)। ১৯. হযরত ইলিয়াস (আ.), তিনি দীর্ঘ জীবন লাভ করেন। ২০. হযরত আল-ইয়াসা (আ.)। ২১. হযরত যাকারিয়া (আ.)। ২২. হযরত ইয়াহিয়া (আ.)। ২৩. হযরত জুলকিফল (আ.), তাঁর জীবনকাল ৭৫ বছর। ২৪. হযরত ঈসা (আ.), তাঁর পার্থিব জীবনকাল ৩৩ বছর। ২৫. হযরত মুহাম্মদ (সা.), তাঁর জীবনকাল ৬৩ বছর।

আরব ভূমিতে প্রেরিত হয়েছেন মাত্র পাঁচজন নবী-রাসূল। তাঁরা হলেন–১. হযরত হুদ (আ.), ২. হযরত সালেহ (আ.), ৩. হযরত ইসমাঈল (আ.), ৪. হযরত শুয়াইব (আ.) ও ৫. হযরত মুহাম্মদ (সা.)।

১৩ বা ১৪ জন নবী-রাসূল খতনা অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেছেন। যেমন–১. হযরত আদম (আ.), ২. হযরত শীশ (আ.), ৩. হযরত ইদরিস (আ.), ৪. হযরত নূহ (আ.), ৫. হযরত সাম (আ.), ৬. হযরত যাকারিয়া (আ.), ৭. হযরত লুত (আ.), ৮. হযরত ইউসুফ (আ.), ৯. হযরত মুসা (আ.), ১০. হযরত শুয়াইব (আ.), ১১. হযরত সুলাইমান (আ.), ১২. হযরত ইয়াহিয়া (আ.), ১৩. হযরত ঈসা (আ.), ১৪. হযরত মুহাম্মদ (সা.) (তাফসিরে কুরতুবী প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং ৭৬)

পৃথিবীতে মহান আল্লাহর রীতি হলো, তিনি প্রতিটি যুগে, প্রতিটি জাতির জন্য সতর্ককারী পাঠিয়েছেন। কখনো কখনো সে সতর্ককারী নবী হিসেবে আগমন করেছেন। কখনো রাসূল হিসেবে আগমন করেছেন। কখনো দাঈ বা ধর্ম প্রচারক হিসেবে আগমন করেছেন। যিনি দাঈ বা ধর্ম প্রচারক, তাঁর জন্য নবী হওয়া জরুরি নয়। ইরশাদ হয়েছে,

وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ

অর্থ : 'অতঃপর শহরের প্রান্তভাগ

থেকে এক ব্যক্তি দৌড়ে এল। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা রাসূলদের অনুসরণ করো।' (সূরা ইয়াসিন, আয়াত : ২০)

উল্লিখিত ব্যক্তি নবী বা রাসূল ছিলেন না, কিন্তু ধর্ম প্রচারক ছিলেন। হযরত লোকমান (আ.) সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে একটি সূরা অবতীর্ণ হয়েছে। বিশুদ্ধ অভিমত হলো, তিনি নবী ছিলেন না। কিন্তু তিনি তাঁর ছেলেকে তাওহীদের শিক্ষা দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে,

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

অর্থ : 'স্মরণ করো, যখন লোকমান উপদেশ ছলে তার পুত্রকে বলল, হে বৎস, আল্লাহর সঙ্গে শরিক কোরো না। নিশ্চয়ই আল্লাহর সঙ্গে শরিক করা মহা অন্যায়।' (সূরা লোকমান, আয়াত : ১৩)।

সুতরাং এতে কোনো সন্দেহ নেই যে মহান আল্লাহ প্রতিটি জাতির উদ্দেশ্যে পথপ্রদর্শক পাঠিয়েছেন। এ বিষয়ে পবিত্র কোরআনে কয়েকটি আয়াত এসেছে,

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ

(১) অর্থ : 'আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাগুত থেকে দূরে থাকো। অতঃপর তাদের মধ্যে কিছুসংখ্যককে আল্লাহ হেদায়াত দিয়েছেন এবং কিছুসংখ্যকের জন্য বিপথগামিতা অবধারিত হয়ে যায়। সুতরাং তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করো এবং দেখো মিথ্যারোপকারীদের কী পরিণতি হয়েছে।' (সূরা নাহল, আয়াত : ৩৬)

এ আয়াত থেকে জানা যায়, আল্লাহর ইবাদত করার ও তাগুত (খোদাদ্রোহী শক্তি) বর্জনের নির্দেশ দিয়ে প্রতিটি জাতির জন্য নবী পাঠানো হয়েছে।

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ

(২.) অর্থ : 'তোমার পালনকর্তা জনপদগুলো ধ্বংসকারী নন, যে পর্যন্ত তার কেন্দ্রস্থলে রাসূল প্রেরণ না করেন, যিনি তাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করেন এবং আমি জনপদসমূহকে তখনই ধ্বংস করি, যখন তার বাসিন্দারা জুলুম করে।' (সূরা কাসাস, আয়াত : ৫৯)

উল্লিখিত আয়াত থেকে জানা যায়, 'সব জাতির জন্য পাঠানো হয়েছে'–কথাটার অর্থ হলো, সব জনপদের কেন্দস্থলে নবী পাঠানো হয়েছে।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ

(৩) অর্থ : 'আমি তোমার আগে অনেক রাসূল প্রেরণ করেছি, তাদের কারো কারো ঘটনা তোমার কাছে বিবৃত করেছি এবং কারো কারো ঘটনা তোমার কাছে বিবৃত করিনি। আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোনো নিদর্শন নিয়ে আসা কোনো রাসূলের কাজ নয়। যখন আল্লাহর আদেশ আসবে, তখন ন্যায়সংগত ফয়সালা হয়ে যাবে। তখন মিথ্যাপন্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।' (সূরা মুমিন, আয়াত : ৭৮)

এ আয়াত থেকে জানা যায়, অনেক নবী-রাসূল এমন রয়েছেন, যাঁদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানেন না।

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ

(৪) অর্থ : 'আমি তোমাকে সত্যধর্মসহ পাঠিয়েছি সংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। এমন কোনো জাতি নেই, যার মধ্যে সতর্ককারী আসেনি।' (সূরা ফাতির, আয়াত : ২৪)

এ আয়াতে নবী-রাসূল শব্দের পরিবর্তে সংবাদদাতা-সতর্ককারী তথা আল্লাহর প্রতিনিধি পাঠানোর কথা বলা হয়েছে।

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ

(৫) অর্থ : ''কাফিররা বলে, 'তার প্রতি তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে কোনো নিদর্শন অবতীর্ণ হয়নি কেন?' '(আল্লাহ বলেন) তোমার কাজ তো (আজাবের ব্যাপারে) ভয় প্রদর্শন করা। আর প্রত্যেক জাতির জন্য পথপ্রদর্শক রয়েছে।' (সূরা রাদ, আয়াত : ৭)

এ আয়াত থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট যে সব জাতির জন্য নবী বা রাসূল পাঠানোর কথার মূল উদ্দেশ্য হলো, সব জাতির জন্য পথপ্রদর্শক পাঠানো হয়েছে।

**ভারতবর্ষে ও আমেরিকায় কি নবী এসেছেন?**

পবিত্র কোরআনের উল্লিখিত আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা বিশুদ্ধ উৎস থেকে না জেনে কোনো কোনো ভাই প্রশ্ন তোলেন যে ভারতবর্ষে, চীনে, আমেরিকায় ও আফ্রিকায় কি কোনো নবী এসেছেন?

তাদের আরো প্রশ্ন : বড় বড় সব নবী কেন মধ্যপ্রাচ্যে এসেছেন?

কেউ কেউ তো বলে বেড়ান যে (নাউজুবিল্লাহ) 'কোরআনে ভুল আছে!' কিভাবে? 'কারণ কেন বলা হয়েছে,

সব জাতির জন্য নবী এসেছে। কিন্তু বাঙালি জাতির জন্য তো কোনো নবী আসেনি! আমেরিকায় তো কোনো নবী আসেনি!'

এগুলো হঠকারিতামূলক প্রশ্ন। এসব প্রশ্ন চরম অজ্ঞতা থেকে উৎসারিত। প্রথম কথা হলো, এ বিষয়ে বর্ণিত আয়াতগুলোর দিকে তাকালে দেখা যায়, এখানে কয়েকটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এক. রাসূল। দুই. হাদ বা প্রথপ্রদর্শক। তিন. বাশির ও নাজির বা সুসংবাদবাহী ও সতর্ককারী।

এ আয়াতগুলোর সামষ্টিক বর্ণনা থেকে যদি এ অর্থ গ্রহণ করা হয় যে, সব জাতির জন্য হাদি বা আল্লাহর পথে পথনির্দেশকারী পাঠানো হয়েছে, তাহলে আর এ প্রশ্ন আসে না যে আমেরিকায়, চীনে, ভারতবর্ষে ও বাংলাদেশে কেন নবী আসেনি? কেননা এসব দেশেও আল্লাহর পথে আহ্বানকারী দাঈরা দ্বীন ও শরীয়ত প্রচার করেছেন। কিন্তু হ্যাঁ, যদি এ অর্থ গ্রহণ করা হয় যে সব দেশে আল্লাহর রাসূল এসেছেন, তাহলেই শুধু এ প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে আমেরিকায়, চীনে, ভারতবর্ষে ও বাংলাদেশে কেন নবী আসেনি? এ প্রশ্নের জবাব দেওয়ার আগে 'রাসূল' শব্দের অর্থ জানা প্রয়োজন। 'রাসূল' শব্দের অর্থ প্রতিনিধি। পরিভাষায় আসমানি গ্রন্থ ও বিশেষ বিধান নিয়ে আসা নবীদের 'রাসূল' বলা হয়। শাব্দিক অর্থের দিকে তাকিয়ে পবিত্র কোরআনে নবীদের পাশাপাশি কোনো কোনো ফেরেশতার জন্য 'রাসূল' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

ইরশাদ হয়েছে,

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ

অর্থ : 'নিশ্চয়ই এই কোরআন একজন সম্মানিত রাসূলের (বহন করা/বাহিত) বার্তা।' (সূরা হাক্কাহ, আয়াত : ৪০)

সর্বসম্মতিক্রমে এ আয়াতে রাসূল মানে জিবরিল (আ.)। সুতরাং সব জাতির জন্য নবী বা প্রতিনিধি প্রেরণ বিষয়ে বর্ণিত আয়াতগুলোতে 'রাসূল' শব্দ যদি নবীদের জন্য ব্যবহৃত হয়, তাহলে আয়াতের অর্থ হলো, ইবাদতের আদেশপ্রাপ্ত প্রাধান দুই জাতি তথা মানুষ ও জিন জাতির কাছে আল্লাহর নবী পাঠানো হয়েছে। সে হিসেবে মানুষ একটি জাতি। জিন একটি জাতি। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনে এসেছে,

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ

অর্থ : '(কিয়ামতের দিন বলা হবে) হে জিন ও মানব জাতি! তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য থেকে রাসূলরা আসেনি, যারা তোমাদের কাছে আমার আয়াত বর্ণনা করত ও তোমাদের আজকের এই দিনের মুখোমুখি হওয়া সম্পর্কে সতর্ক করত? তারা বলবে, আমরা নিজ অপরাধ স্বীকার করে নিলাম। আসলে পার্থিব জীবন তাদের প্রতারিত করেছে। আর তারা নিজেদের বিরুদ্ধে এ সাক্ষ্যও দেবে যে তারা কাফির ছিল।' (সূরা : আনআম, আয়াত : ১৩০)

এ আয়াত থেকে জানা যায়, মানবজাতির উদ্দেশে নবী হিসেবে যেমন মহামানব প্রেরিত হয়েছে, তেমনি জিন জাতির উদ্দেশে নবী হিসেবে জিন প্রেরিত হয়েছে। তবে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি গোটা বিশ্বের মানব ও জিন জাতির রাসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন।

পক্ষান্তরে এসব আয়াতে যদি 'রাসূল' শব্দের আভিধানিক অর্থ গ্রহণ করা হয়, তাহলে আয়াতের মূল অর্থ হলো, প্রত্যেক জাতির জন্য মহান আল্লাহর বাণী প্রচারক ও সতর্ককারী পাঠানো হয়েছে। এই অর্থে বলা যায়, মানবজাতির মধ্যে দ্বিধাবিভক্ত সব জাতিসত্তার মধ্যে আল্লাহর বাণী প্রচারক ও সতর্ককারী পাঠানো হয়েছে, যদিও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তার উদ্দেশে পৃথকভাবে নবী পাঠানো হয়নি। এ প্রসঙ্গে ইরশাদ হয়েছে, 'অবিশ্বাসীরা বলে, তার প্রতি [মহানবী (সা.)] তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে কোনো নিদর্শন অবতীর্ণ হয় না কেন? তুমি তো শুধু সতর্ককারী। আর প্রত্যেক জাতির জন্যই সতর্ককারী আছে।' (সূরা : রাদ, আয়াত : ৭)

সুতরাং বলা যায়, বাংলাদেশ, ভারত, আমেরিকা ও আফ্রিকায় যদি কোনো নবী নাও পাঠানো হয়ে থাকে, তথাপি কোরআনের বক্তব্য সত্য। কেননা এমন কোনো দেশ নেই, যেখানে কোনো ধর্মপ্রচারক যাননি।

দ্বিতীয়ত, কোরআনের ভাষ্য মতে, একসময় গোটা মানবজাতি একজাতি ছিল। পরে মানুষ বহু জাতিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ইরশাদ হয়েছে,

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

অর্থ : 'সব মানুষ একই জাতিসত্তার অন্তর্ভুক্ত ছিল। অতঃপর আল্লাহ নবীদের পাঠিয়েছেন সুসংবাদদাতা ও

ভীতি প্রদর্শনকারী হিসেবে। আর তাঁদের সঙ্গে অবতীর্ণ করেন সত্য কিতাব, যাতে মানুষের মধ্যে বিতর্কমূলক বিষয়ে মীমাংসা করতে পারেন।' (সূরা বাকারা, আয়াত : ২১৩)

হযরত নূহ (আ.)-এর যুগ পর্যন্ত

মানবজাতি একই ভূখণ্ডে ছিল। সেটা ছিল মধ্যপ্রাচ্যকেন্দ্রিক। তাদের জন্য পৃথক পৃথক নবী এসেছেন। এতে কারো দ্বিমত নেই। এর আলোকে বলা যায়, কোরআনের যেসব আয়াতে প্রত্যেক জাতির জন্য রাসূল আসার কথা বলা হয়েছে, সেটা ওই সব জাতির জন্য প্রযোজ্য। সেসব জাতির জন্য নবী-রাসূল আগমন করার বিষয়ে আসমানী ধর্মগ্রন্থ, বিশ্বের ইতিহাস ও পৌরাণিক কাহিনির বর্ণনায় সামঞ্জস্য আছে। কাজেই সব জাতির জন্য রাসূল আসার কথা চিরন্তর সত্য। এ কথার মাধ্যমে কোরআনের ওপর প্রশ্ন তোলার কোনো অবকাশ নেই।

এ আলোচনা থেকে বোঝা যায়, একসময় মানুষের বসতির কেন্দ্রবিন্দু ছিল মধ্যপ্রাচ্য। তাই সেখানেই বেশির ভাগ নবীরা এসেছেন।

তৃতীয়ত, আলাদা আলাদাভাবে যদি চিন্তা করা হয়, তাহলে দেখা যায়, ভারতের হিন্দু ধর্ম, চীনের কনফুসিয়ান ধর্মের কিছু কিছু বিধান ও বিশ্বাস আসমানী ধর্মগুলোর বিধান ও বিশ্বাসের সঙ্গে মিলে যায়। যেমন–

হিন্দুরা মূর্তি পূজা করলেও স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাসী। বহু বিষয়ে ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের সাদৃশ্য আছে। এ বিষয়ে একাধিক বই আছে। বাংলা ভাষায়ও এ বিষয়ে গবেষণা হয়েছে। সিরাত বিশেষজ্ঞ আল্লামা শিবলী নোমানী ও সৈয়দ সুলাইমান নদভী লিখেছেন, মহানবী (সা.)-এর শিক্ষার আলোকে এ বিশ্বাস করাও জরুরি যে দুনিয়ার বড় বড় জাতি ও দেশ যেমন–চীন, ইরান, হিন্দুস্তানেও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আগে আল্লাহর প্রেরিত নবীদের আগমন ঘটেছিল। (সীরাতুন নবী, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা-১৬৯, দি তাজ পাবলিশিং হাউস, ১৯৯১)

ঐশী বিধানের সাথে উল্লিখিত বিধানের সাদৃশ্যতা দেখে অনেকে এসব অঞ্চলের বিভিন্ন ধর্মীয় নেতাদের পয়গম্বর ছিলেন বলেও দাবি করেছেন। তা তাদের সুস্পষ্ট ভ্রষ্টতা। কারণ তা নিরূপণ করার মানদণ্ড হিসেবে পবিত্র কোরআন ও হাদীসে যা বিবৃত হয়েছে তার সাথে এর কোনো সামঞ্জস্যতা পাওয়া যায় না। হতে পারে তাদের কাছে কোনো নবী-রাসূলের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার ঐশী বাণী পৌছে ছিল। যা থেকে তাঁরা উপকৃত হয়েছেন।

চীনে কনফুসিয়ানিজমের সূচনা চীনের ইতিহাসের 'স্প্রিং অ্যান্ড অটাম' পিরিয়ডে। এটি ছিল ৭৭১-৪৭৬ খ্রিস্টপূর্ব, কারো কারো মতে, ৪৩০ খ্রিস্টপূর্ব পর্যন্ত। একটি 'নৈতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক শিক্ষা' হিসেবে এটি আবির্ভূত হয়েছিল। কনফুসিয়ানিজম আলোকপাত করে চীনা উপাখ্যান, দর্শন ও ধর্মের মুখ্য ধারণা ও স্রষ্টার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শনের ওপর। কনফুসিয়াসের কয়েকটি উপদেশ এমন–উপদেশ নম্বর এক. 'আঘাতকে ন্যায়বিচারের মাধ্যমে প্রতিদান দাও, আর দয়ার প্রতিদান দাও দয়া প্রদর্শনের মাধ্যমে।' অন্যদিকে কোরআনে এসেছে।

هل جزاء الاحسان الاالا حسان

অর্থাৎ অনুগ্রহের প্রতিদান অনুগ্রহ ছাড়া আর কী হতে পারে।'

হাদীস শরীফে এসেছে, 'সিল মান কাতাআকা,

صل من قطعك واعف عمن ظلمك واحسن الى من اساء ك

অর্থাৎ বিচ্ছেদকারীর সঙ্গে সম্পর্ক অটুট রাখো, জালিমকে ক্ষমা করো, অনিষ্টকারীর উপকার করো।'

উপদেশ নম্বর দুই. 'যেটা তুমি নিজের ক্ষেত্রে ঘটতে দেখতে চাও না, সেটা অন্যের ক্ষেত্রেও ঘটিয়ো না।' অন্যদিকে হাদীসে এসেছে,

عَنْ أَنَسٍ –رضى الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَيُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَايُحِبُّ لِنَفْسِه

অর্থ : হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, 'তোমাদের কেউ প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য সেটাই পছন্দ করে, যা তার নিজের জন্য পছন্দ করে।' (মুসলিম : ১/১৭ হাদীস : ৪৫, আহমাদ, হাদীস : ১২৮০১, ১৩৮৭৫)

উপদেশ নম্বর তিন. 'নীতিবানের সঙ্গ ছাড়া চরিত্র গঠন সম্ভব নয়।' অন্যদিকে পবিত্র কোরআনে এসেছে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

অর্থ : 'হে ঈমানদাররা! আল্লাহকে ভয় করো ও সত্যবাদীদের সঙ্গী হও।' (সূরা তাওবা, আয়াত : ১১৯)। অন্য আয়াতে এ দু'আ শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে,

رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ

অর্থ : 'হে আমাদের পালনকর্তা! অতঃপর আমাদের সব গোনাহ মাফ করুন ও আমাদের সব দোষ-ত্রুটি মুছে দিন, আর আমাদের মৃত্যু দান করুন নেককার মানুষের সঙ্গে।' (সূরা

ইমরান, আয়াত : ১৯৩)

(সূত্র : প্রাচীন চীনা দর্শন লওস ও কনফুসিয়াস, হেলাল উদ্দিন আহমেদ)

দেখাই যাচ্ছে, এসব কথা ধর্মীয় মূল্যবোধপূর্ণ কথা। ঐতিহাসিকভাবে বিভিন্ন দেশ ও বিভিন্ন সংস্কৃতি কনফুসিয়ানিজমের প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছে। এসব দেশের মধ্যে আছে : চীন, তাইওয়ান, হংকং, ম্যাকাও, কোরিয়া, জাপান ও ভিয়েতনাম। একই সাথে চীনা জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত বিভিন্ন জাতিও এর মাধ্যমে প্রভাবিত হয়েছে। যেমন–সিঙ্গাপুর। কাজেই হতে পারে এসব মনীষীদের কাছে যুগযুগান্তরে নবী রাসূলের মাধ্যমে আল্লাহর বাণী পৌছেছে। কিন্তু আমরা অকাট্যভাবে বলতে পারব না যে কোন নবী রাসূলের বাণী তাঁদের কাছে পৌঁছেছে। কেননা এ বিষয়ে পর্যাপ্ত দলিল-দস্তাবেজ নেই। মানুষ ইতিহাস লেখা শুরু করেছে এই সেদিন। আগের ইতিহাসের খুব সামান্যই মানুষ জানে। কোনো একটা দেশ এমন পাওয়া যাবে না, যে দেশের মানুষের বংশপরম্পরা আদি পিতা থেকে বর্তমান পর্যন্ত তারা জানে। মানুষের জ্ঞান এতই সীমিত যে সে তার পূর্বপুরুষের বংশতালিকাও জানে না। সেটাও সে সংরক্ষণ করতে পারেনি। আরবরা এ বিষয়ে এগিয়ে ছিল, কিন্তু সেটাও স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল না। বর্তমানে তো সেগুলোর চর্চাই হয় না। এ বিষয়ে একটি ঘটনা আমরা স্মরণ করতে পারি।

Leopold Pospisil একটি বই লিখেছেন। বইটির নাম The Kapauku Papuans Of West Guinea. পাপুয়া নিউ গিনির একটা অঞ্চলে বসবাসকারী কিছু প্রস্তর যুগে থেকে যাওয়া মানুষদের ব্যাপারে এই বইটি লেখা হয়েছে। তাদের বলা হয় কাফাউকু জাতি। এরা পশ্চিমা সভ্যতা এর প্রভাবমুক্ত ছিল অনেক বছর। সর্বপ্রথম তারা ১৯৩৮ সনে পশ্চিমা সভ্যতার সংস্পর্শে আসে। তাদের বেশির ভাগ অঞ্চল সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৫০০ মিটার ওপরে অবস্থিত, যার চারপাশ দুর্গম পর্বতসঙ্কুল আর খাড়া গিরিপথে ঘেরা। ওই বইয়ে তাদের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে বলা হয়েছে, The Kapauku has an interesting world view. If we have to compare their religion versus Islam!

অর্থ : 'কাফাউকুদের বিশ্বদর্শন আছে, তাদের ধর্মবিশ্বাসকে আমি ইসলামের সঙ্গে তুলনা করতে পারি।' সে বিশ্বাস কী ধরনের। তার একটি নমুনা রয়েছে ওই বইয়ে। সেখানে রয়েছে : The universe itself and all existence was Ebijata, "designed by Ugatame", the Creator. অর্থ : 'মহাবিশ্ব আর এর অভ্যন্তরস্থ সব বস্তু ছিল অস্তিত্বহীন। পরে সেগুলো অস্তিত্বে আনেন Ugatame বা স্রষ্টা।

তাই বলা যায়, পৃথিবীর ইতিহাস যথাযথ সংরক্ষিত থাকলে বলা যেত যে কোন জাতির কাছে কোন নবী এসেছেন।

**যেকোনো ধর্ম মানলেই কি মুক্তি মিলবে?**

ওপরের আলোচনার আলোকে প্রশ্ন জাগে, সব ধর্ম যদি আল্লাহপ্রদত্ত হয়, তাহলে যেকোনো ধর্ম মানলেও পরকালে মুক্তি পাওয়া যাওয়ার কথা! এ প্রশ্নের প্রথম জবাব হলো, এটা সত্য যে আসমানী সব ধর্মের মূল কথা অভিন্ন।

وَإِنَّ هَـٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ

নবীদের উদ্দেশে এ আয়াতে বলা হয়েছে, 'তোমাদের এই উম্মত, সব তো একই ধর্মের অনুসারী। আর আমি তোমাদের পালনকর্তা। অতএব আমাকে ভয় করো।' (সূরা মুমিনুন, আয়াত : ৫২)

'উম্মত' শব্দের প্রচলিত অর্থ জাতি। কিন্তু সব তাফসীরবিদ এ বিষয়ে একমত যে এ আয়াতে 'উম্মত' শব্দের অর্থ ধর্ম। অর্থাৎ সব নবীর ধর্মের মূলকথা অভিন্ন। তাহলে কোনো নবীর অনুসারীরা যদি নবীর আদর্শবিরোধী কাজ করে, তাদের কিছুতেই ওই নবীর প্রকৃত উম্মত বলা যাবে না। আর সব নবীই শিরকের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন, কিন্তু দেখা যায়, ইহুদি, খ্রিস্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ ধর্মসহ সব ধর্মে শিরক ও মূর্তি পূজা ঢুকে পড়েছে।

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ

অর্থ : 'ইহুদিরা বলে উজাইর আল্লাহর পুত্র, আর নাসারারা বলে, মসিহ আল্লাহর পুত্র। এ হচ্ছে তাদের মুখের কথা। এরা আগের কাফিরদের মতো কথা বলে। আল্লাহ এদের ধ্বংস করুন, এরা কোন উল্টো পথে চলে যাচ্ছে।' (সূরা তাওবা, আয়াত : ৩০)

এসব ধর্মাবলম্বী তাদের ধর্মীয় আদর্শে প্রতিষ্ঠিত নেই বলে এসব ধর্ম মানলে পরকালে মুক্তি পাওয়া যাবে না। স্মরণ রাখতে হবে, আসমানী প্রতিটি ধর্মের মূল কথা ছিল তাওহীদ (একত্ববাদ), রিসালাত (নবীদের প্রতি বিশ্বাস) ও আখেরাত। ইরশাদ হয়েছে,

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ

অর্থ : 'তোমার আগে আমি যত রাসূল পাঠিয়েছি, তাদের এ আদেশই দিয়েছি যে আমি ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই। সুতরাং আমারই ইবাদত করো।' (সূরা আম্বিয়া, আয়াত : ২৫)

কিন্তু বর্তমানে প্রচলিত ধর্মের অনুসারীরা তাদের নবীর সেই একত্ববাদের আদর্শ ছেড়ে দেয়। সুতরাং প্রকৃত অর্থে তাদের ওই নবীর অনুসারী বলা যায় না।

দ্বিতীয়ত, আগের সব নবী এসেছেন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। সবাই এসে বলে গেছেন, আমর পরে আরো নবী আসবে। এমনকি সব নবী তাঁর উম্মতকে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আগমনের কথা বলে গেছেন।

وَإِذْ أَخَذَ اللّٰهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذٰلِكُمْ إِصْرِى قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ

অর্থ : 'আর আল্লাহ যখন নবীদের কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেন যে আমি যা কিছু তোমাদের দান করেছি কিতাব ও জ্ঞান; অতঃপর তোমাদের কাছে কোনো রাসূল আসেন তোমাদের কিতাবকে সত্য বলে দেওয়ার জন্য, তখন তোমরা সে রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে ও তার সাহায্য করবে। তিনি বলেন, তোমরা কি অঙ্গীকার করছ ও এই শর্তে আমার ওয়াদা গ্রহণ করে নিয়েছ? তারা বলল, আমরা অঙ্গীকার করেছি। তিনি বলেন, তাহলে এবার সাক্ষী থাকো। আর আমিও তোমাদের সঙ্গে সাক্ষী রইলাম।' (সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ৮১)

আল্লাহর সঙ্গে কৃত এই অঙ্গীকারের আলোকে প্রত্যেক নবী নিজ নিজ উম্মতকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আগমন ও তাঁর অনুসরণের নির্দেশনা দিয়েছেন। কিন্তু তাঁদের পরবর্তী অনুসারী দাবিদাররা সে অঙ্গীকার পালন করেনি। তাই তাদের কার্যকলাপ গ্রহণযোগ্য নয়। আর ধর্ম হিসেবে ইসলাম গ্রহণ ছাড়া কোনো গত্যন্তর নেই।

একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরো পরিষ্কার হবে। ধরুন, বাংলাদেশের জন্য ব্রিটিশ আমলে একটা সংবিধান ছিল। পাকিস্তান আমলে আমলে আরেকটি ছিল। স্বাধীন বাংলাদেশে নতুন সংবিধান রচনা করা হয়েছে। প্রতিটি সংবিধানই ওই যুগের সমস্যা সমাধানকারী ছিল। এবং নির্দিষ্ট সময়ের পর সেগুলোর আবেদন হারিয়ে গেছে। এখন কেউ যদি স্বাধীন

বাংলাদেশে পাকিস্তানি আমলের সংবিধান চালাতে চায়, তা হবে রাষ্ট্রদ্রোহী কাজ। ঠিক তেমনি আগের নির্দিষ্ট যুগের জন্য আসা সংবিধান বর্তমানে চালানোর চিন্তা হলো ভ্রান্ত চিন্তা। এ ধরনের চিন্তা যেকোনো দেশ, ধর্ম ও সমাজে প্রত্যাখ্যাত।

মানবতার ধর্ম ইসলাম বলেছে, অন্যায়ভাবে কোনো অমুসলিমকেও হত্যা করা যাবে না। ইসলাম মানা বা না মানার ক্ষেত্রে মানুষ স্বাধীন। কিন্তু ইসলাম গ্রহণ না করলেও অমুসলিমরা নিরাপদে মুসলিম দেশে থাকতে পারে। ইরশাদ হয়েছে,

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

অর্থ : 'যে কেউ প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ অথবা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করা ছাড়া কাউকে হত্যা করে, সে যেন সব মানুষকেই হত্যা করে। এবং যে কারো জীবন রক্ষা করে, সে যেন সবার জীবন রক্ষা করে।' (সূরা : মায়েদা, আয়াত : ৩২)

**মুহাম্মদ (সা.)-কে আরবে কেন পাঠানো হয়েছে?**

আগের আলোচনা থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা গেছে যে সব নবীর শিক্ষা ও জ্ঞান নিয়ে মহানবী (সা.) পৃথিবীতে আগমন করেছেন। তাঁকে বিশ্ব মানবতার উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়েছে। তিনি যেমন আরবের নবী, তেমনি আমেরিকার নবী, তেমনি আফ্রিকার নবী, তেমনি বাংলাদেশের নবী, তেমনি ভারতের নবী, তেমনি চীনের নবী। ইরশাদ হয়েছে,

تَبَارَكَ الَّذِى نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا

অর্থ : 'পরম কল্যাণময় তিনি, যিনি তাঁর বান্দার ওপর ফয়সালাকারী গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন, যাতে সে বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হতে পারে।' (সূরা ফুরকান, আয়াত : ১)

অন্য আয়াতে এসেছে,

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى رَسُولُ اللّٰهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِى لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

অর্থ : 'বলে দাও, হে মানবমণ্ডলী। তোমাদের সবার প্রতি আমি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল, গোটা আসমান ও জমিনে যাঁর রাজত্ব।' (সূরা আরাফ, আয়াত : ১৫৮)

প্রশ্ন হলো, মুহাম্মদ (সা.) যদি বিশ্বের নবী হন, তাহলে শুধু আরবে কেন এসেছেন? এর জবাব হলো, ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে মক্কা ও আরব উপদ্বীপ, এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার মধ্যস্থলে অবস্থিত। মক্কা নগরী পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে হওয়ায় মহান আল্লাহ কাবাঘর মক্কায়ই স্থাপন করেন।

ভৌগোলিকভাবে সৌদি আরবই পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু। পৃথিবীর প্রথম ভূমিই মক্কা বা বাক্কা। ইসলাম আসার বহু আগ থেকে মক্কা ঐতিহাসিক নগরী। বহু নবী-রাসূলের পদচিহ্ন লেগে আছে এই পুণ্যভূমিতে। কাবার নিচের অংশটুকু পৃথিবীর প্রথম জমিন। পরবর্তী সময়ে সেখান থেকেই চতুর্দিকে বিস্তৃতি লাভ করেছে। এ কারণে মক্কা শরীফকে উম্মুল কুরা বা নগরীগুলোর মূল বলে অভিহিত করা হয়েছে। (তারিখে তাবারী : ১/৪৯; আল-বাদউ ওয়াত্তারিখ : ৪/৮১-৮২)। উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাকেন্দ্রের পরিচালক ড. খালিদ বাবতিনের নেতৃত্বে পরিচালিত গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে সৌদি আরবে অবস্থিত পবিত্র কাবাই পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু। (আল আরাবিয়া : ২৩ জুলাই, ২০১২)। আরেকটি বিষয় আমরা জানি যে বছরের বিশেষ একটি দিন দুপুরে সূর্য ঠিক মাথার ওপর থাকে। তখন পবিত্র কাবা বা মক্কায় অবস্থিত কোনো অট্টালিকায় ছায়া দৃষ্টিগোচর হয় না। যেমন–২০১৪ সালের ২৮ মে দুপুর ১২টা ১৮ মিনিটে সূর্য ছিল পবিত্র কাবার ঠিক মাথার ওপরে। (কালের কণ্ঠ : ২৮ মে, ২০১৪)। অথচ পৃথিবীর আর কোথাও এমনটি হয় না। সুতরাং সৌদি আরব বা মক্কা পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু হওয়ায় মহানবী (সা.)-কে সেখানে পাঠানো হয়েছে, যাতে পৃথিবীর চারদিকে সত্যের আওয়াজ পৌঁছে যায়। মহান আল্লাহ বলেন,

وَكَذٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ

অর্থ : ‘আর এভাবেই আমি তোমার ওপর আরবি ভাষায় কোরআন নাজিল করেছি, যাতে তুমি মূল জনপদ ও তার আশপাশের বাসিন্দাদের সতর্ক করতে পারো, আর যাতে একত্রিত হওয়ার দিনের ব্যাপারে সতর্ক করতে পারো, যার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।’ (সূরা : শুরা, আয়াত : ৭)

ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও তাৎপর্যের দিক থেকেও মক্কা নগরী মানবসভ্যতার প্রাণকেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত। এ নগরীতে হাজেরা (আ.)-এর স্মৃতিবিজড়িত সাফা-মারওয়া, জমজম কূপ ও জান্নাতি পাথর হাজরে আসওয়াদসহ আল্লাহ তা’আলার অনেক নিদর্শন রয়েছে। আল্লাহ তা’আলা বলেন,

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ

অর্থ : ‘সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনগুলোর অন্যতম।’ (সূরা : বাকারা, আয়াত : ১৫৮)

এটা হলো প্রথম জবাব যে যেহেতু মক্কা গোটা বিশ্বের মধ্যভাগে অবস্থিত। তাই মহানবী (সা.)-কে মক্কায় পাঠানো হয়েছে।

দুই নম্বর জবাব হলো, মহানবী (সা.)-এর সময়ে পৃথিবীর মধ্যে নামিদামি ও আলোচিত জাতি ছিল চারটি। রোম, পারস্য, গ্রিক ও হিন্দুস্তানি। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এসব দেশে সভ্যতার ছোঁয়া লেগেছিল। ভারতে সিন্ধু সভ্যতা। রোম ও পারস্যে রাজা-বাদশাহ ও সাম্রাজ্যবাদী কর্মতৎপরতা ছিল। গ্রিক দর্শন ছিল গ্রিসে। কিন্তু আরবে কোনো সভ্যতার ছোঁয়া লাগেনি। আরব জাতি ছিল একেবারে আদিম ও অজ্ঞ। মহানবী (সা.)-এর সময়ে মাত্র ১৭ জন শিক্ষিত মানুষ ছিল গোটা আরবে। সুতরাং মহানবী (সা.)-কে আরবে পাঠানো হয়েছে সেখানে নতুন সভ্যতার জন্ম দেওয়ার জন্য। তিনি আরব সভ্যতা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি বিশ্বকে দেখিয়ে দিয়েছেন, একজন মহামানব কিভাবে একটি পতিত জাতিকে বিশ্বের প্রথমসারির জাতিতে পরিণত করেছেন। তিনি কারো কাজ থেকে সভ্যতার জ্ঞান শিখেননি। তিনি কারো কাছ থেকে ‘কপিপেস্ট’ করেছেন, এ কথা কেউ যেন বলতে না পারে, তাই তাঁকে ‘উম্মিদের’ (অজ্ঞদের) মধ্যে পাঠানো হয়েছে।

ইরশাদ হয়েছে,

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

অর্থ : ‘তিনিই নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তাঁর আয়াতসমূহ, তাদের পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত। ইতিপূর্বে তারা ছিল ঘোর পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত।’ (সূরা জুমুআ, আয়াত : ২)

এ দীর্ঘ আলোচনা থেকে কয়েকটি বিষয় জানা যায়। এক. যুগে যুগে, দেশে দেশে ধর্ম প্রচারকরা আল্লাহর বাণী প্রচার করেছেন। দুই. সব দেশে নবী আসা জরুরি নয়। কেননা নবীদের অনুসারীরা তাঁদের শিক্ষা সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। তিন. ইসলাম আসার পর অন্য ধর্ম অনুসরণ করলে আল্লাহর কাছে তা গ্রহণযোগ্য নয়। চার. মহানবী (সা.) গোটা বিশ্ব মানবতার উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছেন। মক্কা পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু হওয়ায় ও সভ্যতার আলো থেকে দূরে থাকায় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে সেখানে পাঠানো হয়েছে।

রাসূল (সা.)-এর প্রতি প্রেম-ভালোবাসা-৩

# রাসূল (সা.)-এর প্রতি সাহাবায়ে কেরামের ভালোবাসা

**আল্লামা ড. শায়খ নূরুদ্দীন** (সাবেক প্রভাষক : জামিয়াতু দামাস্ক)
**ভাষান্তর : মুফতী আতীকুল্লাহ**

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি সাহাবায়ে কেরামের মুহাব্বত ও ভালোবাসা কত গভীর ছিল, তা এককথায় বে-নজির ও অতুলনীয়। অন্যদের সাথে তার কোনো তুলনা হতে পারে না। কেননা সাহাবায়ে কেরামের ইশক ও মুহাব্বত ছিল সরাসরি সাক্ষাৎ ও দর্শনের, পক্ষান্তরে অন্যদের প্রেম-ভালোবাসা ছিল শ্রুতিনির্ভর। দর্শন ও শ্রবণ কখনো এক হতে পারে না। এমনকি যাঁরা শেষের দিকে ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তাঁরাও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ফযল ও কামাল এবং মান-মর্যাদা ও মহত্ত্বকে এক বাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন। কারণ তাঁরাও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কামাল ও জামাল, কীর্তি ও কিরদার এবং নবুয়তের দলিলসমূহকে সচক্ষে অবলোকন করেছেন। এত দিন যাবৎ ইসলাম গ্রহণে যে জিনিসটি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে আসত তা হলো, জাহেলী যুগের স্বজনপ্রীতি, স্বগোত্রপ্রীতি এবং বংশীয় আভিজাত্য। কিন্তু যখনই এই পর্দা উঠে গেল, তাঁরা ঈমান নিয়ে এলেন। যেমনি ছিল তাঁদের ঈমান পাহাড়সম মজবুত ও দৃঢ়তম, তেমনি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি তাঁদের মুহাব্বতও ছিল গভীরতম, এমনকি স্বীয় জানমাল ও জীবনসর্বস্ব বিসর্জনে সদা প্রস্তুত ছিলেন।

হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) বলেন,

ما كا أحد أحب إلى من رسول الله صلى الله عليه وسلم...

আমার নিকট রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর চেয়ে বেশি কেউ প্রিয় ছিলেন না।

তাঁর মতোই ছিলেন হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা.)। যাঁকে স্বীয় সুষ্ঠু বিবেক ও আকলে সালীম পথপ্রদর্শন করেছিল। ইসলাম গ্রহণ করেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পথে নিজের সব কিছু কোরবান করে দিয়েছেন। যাঁকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) "সাইফুল্লাহ" (আল্লাহর তরবারি) উপাধি দিয়েছেন।

এই সেই খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা.), যাঁর মোবারক জবানে মৃত্যুশয্যায় উচ্চারিত হয় সেই ঐতিহাসিক বাক্য, যা স্বর্ণাক্ষরে খচিত আছে ইতিহাসের পাতায় পাতায়, যা অঙ্কুরিত হয়ে আছে মুজাহিদীনের হৃদয়ে হৃদয়ে। তিনি বলেন,

حضرت مأة معركة، ومافى جسمى موضع الا فيه ضربة بسيف، او طعنة برمح او رمية بسهم، وها انا ذا اموت على فراشى كما يموت البعير فلانامت اعين الجبناء

শত শত জিহাদের ময়দানে উপস্থিত ছিলাম। আমার শরীরে এমন কোনো জায়গা নেই, যেখানে তলোয়ার, বর্শা কিংবা তীরের আঘাতের চিহ্ন নেই অথচ আজ আমি উটের ন্যায় বিছানার ওপর মরছি। আল্লাহর শপথ! বুযদিল ও ভীরুদের চোখে যাতে ঘুম না আসে।

সাধারণ সাহাবায়ে কেরামের (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) অবস্থা কেমন ছিল, তাও মুতাওয়াতের ও প্রসিদ্ধ বর্ণনাসূত্রে আমাদের নিকট পৌঁছেছে এবং বিশেষ বিশেষ সাহাবীয়ে রাসূলের কথাও বিশুদ্ধ বর্ণনা দ্বারা সাব্যস্ত ও প্রমাণিত।

তাই তাঁদের সেই অতুলনীয় ত্যাগ-আত্মত্যাগের এবং মুহাব্বত ও ভালোবাসার কথা অতি সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করছি।

তবে সেই সব সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা দ্বারা শুরু করছি, যাঁদেরকে মক্কা মুকাররমায় বর্ণাতিত কষ্ট দেওয়া হয়েছে ও অত্যাচার করা হয়েছে, আর তাঁরা আল্লাহ তা'আলার যিকর ও তাওহীদ দ্বারা তা মোকাবেলা করেছেন। হযরত বিলাল (রা.) মোবারক জবানে আহাদ! আহাদের আওয়াজ উঁচু হয় এবং এই কঠিন অত্যাচরের মোকাবেলা করেন ঈমানের স্বাদ ও আল্লাহ এবং স্বীয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ইশক ও মুহাববত এবং প্রেম ও ভালোবাসার স্বাদ দ্বারা। এর পর থেকে হযরত বিলাল (রা.) ও তাঁর মতো

অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম এসব কষ্ট, অন্যায়-অত্যাচার ও জুলম তা যতই কঠিন ও বেদনাদায়কই হোক না কেন, পরোয়া করতেন না।

**বদরযুদ্ধে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি সাহাবায়ে**

**কেরামের মুহাব্বত :**

বদরযুদ্ধে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মুহাববতে ও তাঁর প্রেম-ভালোবাসায় সাহাবায়ে কেরামের কোরবানী এবং জীবনসর্বস্ব বিসর্জন দেওয়ার ঘটনা কে না জানে।

বদরযুদ্ধের প্রস্তুতির সময় হযরত সা'আদ ইবনে মু'আয (রা.) যিনি আনসারী সাহাবার অন্যতম সরদার ছিলেন, যিনি বদরযুদ্ধে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্য ছায়ানীড় তথা অবস্থানের জন্য ছোট তাঁবু বানানোর পরামর্শ দিয়েছিলেন, যাতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার ছায়াতে বসতে পারেন। তিনি বলেন,

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! মদীনায় কিছু ব্যক্তি এমন রয়ে গিয়েছে আপনার প্রতি যাদের মুহাব্বত আমাদের চেয়ে কোনো অংশে কম হবে না। যদি তারা জানতে পারত এ সফরে আপনাকে যুদ্ধের সম্মুখীন হতে হবে তবে তারা কখনো বসে থাকত না, পিছে থেকে যেত না। আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য আপনাকে হেফাজত করবেন। তারা আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী এবং আপনার সাথে জিহাদে অংশগ্রহণে সদা প্রস্তুত।'

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের প্রশংসা করেন এবং তাদের জন্য দু'আ করে দিলেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্য ছায়ানীড় বানানো হলো, যার মধ্যে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাাইহি ওয়াসাল্লাম) আরাম করলেন আর হযরত আবু বকর (রা.) ছাড়া কারো এ সাহস হলো না যে নাঙ্গা তলোয়ার নিয়ে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর চৌকিদার হবেন। অতঃপর যখন যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শত্রুব্যূহে চলে গেলেন আর যুদ্ধের পোশাক পরিধানরত অবস্থায় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই আয়াতটি পাঠ করছিলেন,

سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ

"অতিসত্বর এই দলটি পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পলায়ন করবে।" (সূরা কমর : ৪৫)

**গাযওয়ায়ে রজী রাসূল (সা.)-এর প্রতি সাহাবায়ে কেরামের ভালোবাসা :**

মুশরিকরা মুয়াল্লিম সাহাবাগণের সাথে ওয়াদা ভঙ্গ করে যুদ্ধ শুরু করল এবং প্রায় সকলকে হত্যা করে ফেলল; প্রতারণার শিকার হয়ে যখন হযরত খুবাইব (রা.), হযরত যায়দ ইবনে দাসিনা (রা.) ও আব্দুল্লাহ ইবনে তারেক কিংবা আসেম (রা.) দুশমনদের হাতে আত্মসমর্পণ করলেন, তখন পথিমধ্যে হযরত আসেম (রা.)-কে শহীদ করে দেওয়া হলো। আর হযরত যায়দ ইবনে দাসিনাকে ছাফওয়ান ইবনে উমাইয়া ৫০টি উটের পরিবর্তে ক্রয় করে নিল পিতা হত্যার বদলা নেওয়ার জন্য। অনুরূপ হযরত খুবাইব (রা.)-কেও মক্কা মুকাররমায় নিয়ে যাওয়া হলো বদরযুদ্ধে নিহত মুশরিকদের রক্তের বদলা নেওয়ার জন্য।

হযরত খুবাইব (রা.)-কে মুশরিকরা বলল, তুমি কি চাইবে মুহাম্মদ তোমার স্থলে হোক?

তিনি বললেন, মহান আল্লাহর কসম করে বলছি, তা কখনো হতে পারে না; আমি এমনও চাইব না যে আমার জানের বদলায় প্রিয় হাবীব (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পা মোবারকে সামান্য কাঁটাও বিঁধবে।"

যখন যায়দ ইবনে দাসিনা (রা.)-কে হত্যা করার জন্য হেরমের বাহিরে নিয়ে আসা হলো, তখন যায়দ (রা.)-এর তামাশা দেখার জন্য অনেক লোকের সমাগম হলো, তন্মধ্য থেকে আবু সুফিয়ান ইবনে হারব (তখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি) যায়দ (রা.)-কে আমোদ করে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি চাইবে যে এ মুহূর্তে আমাদের সামনে মুহাম্মদ তোমার স্থানে থাকবেন এবং তাঁকে তোমার জায়গায় হত্যা করা হবে, আর তুমি নিজ পরিবার-পরিজনের সাথে থাকবে? তিনি বললেন, 'আল্লাহর কসম! কখনো না, না! আমি এমনও চাইব না যে প্রিয় হাবীব (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ মুহূর্তে যেখানেই থাকুন না কেন, আমার মুক্তির জন্য তাঁর পা মোবারকে সামান্য কাঁটা বিঁধবে এবং তাতে তাঁর কষ্ট হবে আর আমি ঘরে বসে থাকব; এমনটি কল্পনাও করা যায় না।' এ কথা শুনে উপস্থিত লোকেরা তাঁকে উপহাস করতে লাগল, আর আবু সুফিয়ান বলে উঠল, আল্লাহর কসম! কেউ কাউকে এমন ভালোবাসতে দেখিনি, যেমনটি মুহাম্মদের শিষ্যরা তাঁকে ভালোবাসে। (হায়াতুস সাহাবা, ৭৫/২)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি সাধারণ সাহাবায়ে কেরামের মুহাব্বত কেমন ছিল তার প্রমাণে উপরিউক্ত ঘটনাই যথেষ্ট।

**বনু মুসতালিক যুদ্ধে সাহাবায়ে কেরামের মুহাব্বত :**

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট সংবাদ এল যে বনু মুসতালিক গোত্র তাদের প্রধান সরদার হারেছ বিন আবু যারারের নেতৃত্বে মদীনায় আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তাদের আক্রমণের সুযোগ না দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের ওপর আক্রমণ করে বসলেন। বহু ব্যক্তিকে বন্দি করলেন এবং তাদের স্ত্রী ও ছেলে-সন্তানদের

গোলাম বানিয়ে নিলেন। তাদের সংখ্যাও বহু বেশি ছিল। তাদের সকলকে মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন। সেসব গোলামের মধ্যে গোত্রপ্রধান হারেছ বিন আবু যারারের কন্যাসন্তান জুওয়াইরিয়াও ছিলেন। জুওয়াইরিয়া নিজ মুনিবের সাথে 'কেতাবত'-এর চুক্তি করে নিলেন, অর্থাৎ তার সাথে এ মর্মে চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন যে, তিনি যদি মুনিবকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ-সম্পদ আদায় করেন তবে তাঁকে আযাদ করে দেবে।

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.) ইরশাদ করেন, 'জুওয়াইরিয়া (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দরবারে হাজির হলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট চুক্তিতে নির্ধারিত অর্থ আদায়ে সাহায্যের দরখাস্ত করলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আরো উত্তম প্রস্তাব গ্রহণ করবে কি? তিনি বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! তা কী? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'আমি তোমার পুরো মুক্তিপণ আদায় করে দেব এবং তোমাকে বিয়ে করে নেব। তিনি বললেন, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম) বললেন, ঠিক আছে এমনি করে দিলাম। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে এ কথা জানাজানি হয়ে গেল যে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জুওয়াইরিয়া বিনতে হারেছ (রা.)-কে বিয়ে করেছেন তখন তাঁরা বলতে লাগলেন,

হযরত জুওয়াইরিয়া (রা.)-এর গোত্র রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শ্বশুর গোত্রে পরিণত হয়ে গিয়েছে। অতঃপর সাহাবায়ে কেরাম সকল গোলামকে কোনো ধরনের মুক্তিপণ নেওয়া ছাড়া আযাদ করে দিলেন।" আল্লাহু আকবর!

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা.) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এ বিয়ের বরকতে বনু মুসতালিকের প্রায় শত শত পরিবার আযাদ হয়ে গেল, নিজের গোত্রের জন্য এমন ধন্য ও বরকতময় নারী আমার চোখে পড়েনি।"

সাহাবায়ে কেরাম রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে কত বেশি মুহাব্বত করতেন; বনু মুসতালিকের ১০০টি পরিবার, যার সদস্য ৭০০ জনের মতো বলা হয়েছে, যার মধ্যে প্রতিটি ব্যক্তির মাথার মূল্য হবে বর্তমান যুগের উন্নত গাড়ির সমান আর তাদের সকলকে সাহাবায়ে কেরাম আযাদ করে দিয়েছেন। তার একমাত্র কারণ হলো, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম) সে গোত্রের এক নারীকে বিয়ে করেছেন। এসব ত্যাগ-আত্মত্যাগ মূলত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে অত্যধিক মুহাব্বত করার কারণে সম্ভব হয়েছে। কেননা সে গোত্র রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শ্বশুর গোত্রে পরিণত হয়েছে।

**হুদাইবিয়ার যুদ্ধে সাহাবায়ে কেরামের মুহাব্বত ও ভালোবাসা :**

ওরওয়া ইবনে মাসউদ সাকাফীর স্বীকারোক্তি : মক্কা মুকাররমার মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও সাহাবায়ে কেরামকে হুদাইবিয়ার প্রান্তরে মক্কায় প্রবেশ করা ও উমরা করা থেকে বাধা প্রদান করেছিল। অন্যদিকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বারবার ঘোষণা দিচ্ছিলেন যে আমরা যুদ্ধ করার জন্য আসিনি, বায়তুল্লাহ শরীফের তাজিম ও উমরা আদায় করার নিমিত্তে এসেছি। এদিকে কুরাইশের প্রতিনিধি হুদাইবিয়ার সন্ধিবিষয়ক আলোচনার জন্য আসা-যাওয়ার মধ্যে ছিল। তাদের একজন ওরওয়া ইবনে মাউসদ সাকাফীও ছিলেন। তাঁর আলোচনা বোখারী শরীফসহ অন্য হাদীসের কিতাবসমূহে করা হয়েছে। সেখানে এ কথাও আছে যে তিনি সাহাবায়ে কেরামকে গভীর দৃষ্টিতে দেখছিলেন। যার চিত্রায়ণ তিনি নিজেই করেছেন এভাবে,

ওরওয়া ইবনে মাসউদ সাকাফী সাহাবায়ে কেরামের উপস্থিতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে হুদাইবিয়ার সন্ধিবিষয়ক আলোচনা থেকে ফিরে কুরাইশকে সম্বোধন করে বললেন, হে কুরাইশ সম্প্রদায়! আমি কিসরা, কায়সার ও নজ্জাসীর দরবার দেখেছি। আল্লাহর কসম আমার চোখে পড়েনি কোনো রাজাকে তাঁর সভাসদরা এতটা ভক্তি-শ্রদ্ধা ও মুহাব্বত করতে। যতটা মুহাম্মদকে তাঁর সাহাবারা করে থাকেন। আল্লাহর শপথ! তাঁদের অবস্থা হলো, যখন তিনি ওজু করেন, পানি মাটিতে পড়তে দেন না, এমনকি প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়, কে কার আগে ওজুর পানি সংগ্রহ করবেন। তিনি যখন কথা বলেন, তখন সবার মাঝে পিনপতন নীরবতা নেমে আসে। আর আদবের প্রাবল্যে তাঁরা তাঁর দিকে পূর্ণ নজরে তাকাতেও পারেন না।

সাহাবায়ে কেরামের মুহাব্বতবিষয়ক নিম্নেবর্ণিত দুটি মাশহুর হাদীস রয়েছে,

ইমাম বায়হাকী (রা.) এক আনসারী সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন, "রাসূলুল্লাহ

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন ওজু করেন কিংবা থুথু ফেলেন, সাহাবায়ে কেরাম পানি ও থুথু মোবারক মাটিতে পড়তে দেন না, এমনকি প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়, কে কার আগে ওজুর পানি এবং থুথু মোবারক সংগ্রহ করবেন। তাঁর এই পানি ও থুথু মোবারক নিয়ে শরীরে ও চেহারায় মাখেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁদের জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা এমন আচরণ করো কেন? তাঁরা বললেন, বরকত অর্জনে ধন্য হওয়ার জন্য। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সন্তুষ্টি ও মুহাব্বত পেতে চায় তার উচিত সে যেন সর্বদা সত্য বলে, আমানত রক্ষা করে এবং প্রতিবেশীদের কষ্ট না দেয়।"

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এ কথা বলার কারণ হলো, তিনি দেখলেন সাহাবায়ে কেরামের কথায় তাঁর প্রতি তাঁদের ইশক ও মুহাব্বত এবং প্রেম ও ভালোবাসার ঝলক ফুটে উঠছে। তাই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁদের এমন আচার-আচরণ শিক্ষা দিলেন, যা তাঁদের উক্ত মুহাব্বতে পূর্ণতা দান করবে এবং সঠিক মুহাব্বত প্রকাশের পথ সুগম করবে। এর অর্থ এই নয় যে আগে তাঁদের মধ্যে রাসূল (সা.)-এর মুহাব্বত ছিল না। বরং অতিমাত্রায় মুহাব্বত আছে বলেই তাঁরা ওজুর পানি চেহারায় মাখতেন।

ইমাম তাবরানী (রহ.) হযরত আব্দুর রহমান ইবনে হারেছ সুলামী (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম, সে সময় তিনি পানি চাইলেন। (পানি নিয়ে আসা হলে) সেই পানিতে হাত রেখে ওজু করলেন। সে পানি আমরা পান করে ফেললাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'তোমাদের কোন জিনিসটি এ কাজে অনুপ্রাণিত করল? সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মুহাব্বত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, তোমরা যদি চাও যে তোমাদেরও আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুহাববত করুক তবে তোমরা এ কাজ করো, যদি তোমাদের কাছে আমানত রাখা হয় তবে তা যথাযথ আদায় করবে, যখন কথা বলবে সত্য বলবে এবং যে তোমাদের প্রতিবেশী হবে তার সাথে উত্তম আচরণ করবে।"

তাতে বোঝা গেল, রাসূল (সা.)-এর আদেশ-নিষেধ মতে জীবন পরিচালনা করা এবং রাসূল (সা.)-এর সুন্নাত ও আদর্শ গ্রহণ করাই রাসূল (সা.)-এর মুহাব্বত প্রকাশের প্রকৃত পন্থা।

**হুনায়নযুদ্ধে রাসূল (সা.) কর্তৃক আনসারী সাহাবীগণকে সুসংবাদ প্রদান :** বোখারী শরীফের হাদীস, হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুনায়নের যুদ্ধে হাওয়াযিন ও গাতফান গোত্রসমূহের লোকেরা নারী-শিশুসহ এক বিশাল দল নিয়ে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য দাঁড়িয়ে গেল। তাঁর সঙ্গে ছিল ১০ হাজার সাহাবী এবং মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণকারী নওমুসলিমগণ। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর সাহাবায়ে কেরাম পরস্পর বিক্ষিপ্ত এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। সে মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ভিন্ন ভিন্ন দুটি আওয়াজ দিলেন। ডান দিকে তাকিয়ে আওয়াজ দিলেন, "ওহে আনসারগণ!" তাঁরা ঐক্যবদ্ধভাবে জবাব দিলেন, "আমরা হাজির, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার সাহায্যে আমরা প্রস্তুত এবং আপনার সামনেই আমরা উপস্থিত।" অতঃপর বাম দিকে তাকিয়ে আওয়াজ দিলেন, "হে আনসারগণ!" তখন আনসারীগণ উত্তর দিলেন, "হে রাসূলুল্লাহ! আমরা উপস্থিত।" রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বীয় সওয়ারী থেকে নেমে পড়লেন আর বলতে লাগলেন, আমি আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রাসূল। মুশরিকরা পরাজিত হলো। সেদিন গনিমতের প্রচুর সম্পদ অর্জিত হলো। রাসূল (সা.) উক্ত গনিমতের সম্পদ নওমুসলিম ও মুহাজিরদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন। আনসারদের কিছুই দিলেন না। এতে আনসারদের কিছু যুবক নিজেদের মধ্যে সে কথা বলাবলি করছিল। তখন রাসূল (সা.) তাদের ডেকে এনে একটি তাঁবুর ভেতর একত্রিত করলেন এবং বললেন, তোমরা কি এ কথার ওপর সন্তুষ্ট থাকবে না যে, লোকজন তো পার্থিব সম্পদ নিয়ে চলে যাবে আর তোমরা আল্লাহর রাসূলকে সাথে নিয়ে নিজেদের ঘরে ফিরবে? সকলে উত্তরে বললেন, নিশ্চয়ই আমরা সন্তুষ্ট। এরপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, যদি লোকজন একটি উপত্যকা দিয়ে গমন করে আর আনসার অন্য উপত্যকা দিয়ে গমন করে তাহলে আমি আনসারদের সাথেই চলব।" (বোখারী শরীফ, হা. ৩৯৯৭)

ছাকীফ ও হাওয়াযিন গোত্র যুদ্ধের ময়দানে নিজেদের সাথে ধন-সম্পদ, গবাদি পশু, স্ত্রী ও ছেলেসন্তান সকলকে

নিয়ে এসেছিল। যাতে তাদের উপস্থিতিতে জযবা ও বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করা যায় এবং পরাজয় থেকে বাঁচা সম্ভব হয়। কিন্তু বাস্তবে উল্টোটা ঘটল। তাদের সব কিছুই গনিমত হিসেবে মুসলমানদের হস্তগত হয়ে যায়। এমনকি বন্দি ও গোলাম-বাঁদী দ্বারা ভরে যায় মুসলমানদের ঘরবাড়ি। অথচ

মুহাজির ও আনসার সাহাবীগণ গোলাম ও বন্দিদের মধ্য থেকে নিজেদের অংশ গ্রহণ করেননি। এমনিভাবে তারা সকলে আযাদ হয়ে যায়। একমাত্র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সন্তুষ্টি ও মুহাব্বত অর্জনে ধন্য হওয়ার জন্যই এসব ত্যাগ-তিতিক্ষা ও কোরবানী সর্বস্ব বিসর্জন দিয়েছে তারা। এসব রাসূল (সা.)-এর প্রতি সাহাবায়ে কেরামের গভীর মুহাব্বত ও অতুলনীয় ভালোবাসার অবিস্মরণীয় প্রমাণ।

এরূপই আরেকটি ঘটনা, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পবিত্র মক্কা নগরীতে প্রবেশ করে ছাফা পাহাড়ে দাঁড়ালেন এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করতে লাগলেন তখন আনসারী সাহাবারা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম)-কে গভীর দৃষ্টিতে অবলোকন করছেন এবং পরস্পর আলোচনা করতে লাগলেন। তাঁরা বলছিলেন, এমন নয় তো! রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে যখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর আপন শহর ও জন্মভূমির বিজয় দান করেছেন তবে কি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের ছেড়ে এখানেই থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে নেবেন? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দু'আ শেষ করার পর আনসারগণকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কী যেন আলাপ করছিলে? তাঁরা বললেন, তেমন কোনো বিশেষ বিষয় নয়। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বারবার জিজ্ঞেস করলে, তারা আলোচনার বিষয়টি বলে দেন। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, "মা'আযাল্লাহ! আমার জীবনযাপনও তোমাদের সাথে এবং মৃত্যুবরণও তোমাদের সাথে।"

এ ঘটনার দ্বারা আনসার সাহাবীদের রাসূল (সা.)-এর প্রতি অতীব ভালোবাসা, আবার রাসূল তাঁদের ছেড়ে দেওয়ার আশঙ্কায় ভীত হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট হয়। আনসারদের সাথে তাঁর ইন্তেকালের গায়েবী খবরটা রাসূল (সা.)-এর মুজিযার অন্তর্ভুক্ত। কেননা কোনো মানুষের জানা নেই কোন ভূমিতে তার মৃত্যু হবে।

**রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মুহাব্বত ও ভালোবাসায় সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক প্রতিযোগিতা :**

ইমাম তাবরানী (রহ.) হযরত কা'আব ইবনে আ'জরাহ থেকে বর্ণনা করেন।

তিনি বলেন, "একদিন আমরা মসজিদে নববীতে ছিলাম; একটি জামা'আত ছিল আনসার সাহাবীগণের অন্যটি ছিল মুহাজির সাহাবীগণের, আরেকটি ছিল বনু হাশেমের জামা'আত। আলোচনা শুরু হলো। আমাদের মধ্য কারা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে সর্বাধিক প্রিয় ও সবচেয়ে বেশি নৈকট্য অর্জনকারী।

আমরা বললাম, আমরা আনসারাই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওপর ঈমান এনেছি, পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ-অনুকরণ করেছি। একসাথে জিহাদ করেছি এবং ময়দানে আমাদের দল সম্মুখভাবে থাকত।

সুতরাং আমারাই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে সর্বাধিক প্রিয় ও সবচেয়ে বেশি নৈকট্য অর্জনকারী।

মুহাজির ভাইগণ বললেন, আমরা তো ওই ব্যক্তি, যাঁরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে হিজরত করেছি, স্বীয় গোত্র, স্ত্রী-সন্তান ও অর্থ-সম্পদ ত্যাগ করেছি। যেখানেই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উপস্থিত হয়েছেন, সেখানে আমরাও ছিলাম। যেসব জিহাদে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শরীক হয়েছেন আমারও সেখানে হাজির হয়েছিলাম। সুতরাং আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট সর্বাধিক প্রিয় এবং সবচেয়ে বেশি নৈকট্য অর্জনকারী।

বনু হাশেম বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর স্বগোত্রীয়, আমারা সেসব স্থানে হাজির ছিলাম, যেখানে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছিলেন। সকল যুদ্ধে রাসূল (সা.)-এর সাথে শরীক ছিলাম। সুতরাং আমরাই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে সর্বাধিক মাহবুব এবং তাঁর সবচেয়ে বেশি নিকটবর্তী।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাশরীফ আনলেন এবং আমাদের দিকে মনোযোগী হয়ে বললেন, তোমরা কী বিষয়ে আলোচনা করছিলে? আমরা (আনসার) নিজেদের কথাগুলো শোনালাম। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আনসারী সাহাবায়ে কেরামকে সম্বোধন করে বললেন, তোমরা সত্য বলেছ, কে আছে তোমাদের কথা অস্বীকার করবে।

অতঃপর মুহাজির ভাইদের আলোচনাও শোনানো হলো। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তাঁরাও

সত্য বলেছেন; কে আছে তাঁদের কথা রদ করে? অতঃপর আমরা বনু হাশেমের কথা শোনালাম, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তাঁরা সত্য বলেছেন; কে আছে তাঁদের কথা অস্বীকার করবে?

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, আমি কি তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করব না? আমরা বললাম, কেন নয়? আমাদের বাপ-দাদা, মা-বোন সকলে আপনার ওপর কোরবান হোক ইয়া রাসূলাল্লাহ! তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করলেন, হে আনসার! আমি তো আপনাদেরই ভাই। আনসারী সাহাবা এ কথা শুনে আনন্দের আতিশয্যেই উচ্চস্বরে আল্লাহু আকবর বলে তাকবীর ধ্বনি দিয়ে উঠলেন। হে মুহাজির সাহাবা! আমি তো আপনাদের মধ্য থেকেই। মুহাজির সাহাবগণও অতিশয় আনন্দে সমুচ্চস্বরে আল্লাহু আকবর বলে না'রা দিলেন। হে বনু হাশেম আপনারা আমার থেকে এবং আমার সাথেই তো আছেন।' হযরত কাআব ইবনে আ'জরা (রা.) বলেন, আমরা সকলে অতিশয় আনন্দিত অবস্থায় মজলিস থেকে উঠি এবং প্রিয় হাবীব (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওপর গিবতা করছিলাম।

**সাহাবা কর্তৃক মুহাব্বতের প্রকাশ :**

হযরত আনাস (রা.)-এর হাদীসে আছে, রাসূল (সা.) যেদিন মদীনা শরীফে প্রবেশ করেন সেদিন মদীনার প্রতিটি জিনিস আলোকিত হয়ে যায়, যেদিন রাসূল (সা.) ইন্তেকাল করেন সেদিন প্রতিটি বস্তুতে অন্ধকার ছেয়ে যায়।

ইমাম বোখারী (রহ.) বর্ণনা করেন। হযরত আনাস (রা.) বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি নবী করীম (সা.)-এর কাছে কিয়ামত সম্পর্কে জানতে চান, যে কিয়ামত কখন হবে? রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, তুমি কিয়ামতের জন্য কী প্রস্তুতি করেছ? তিনি বললেন, কিছুই না। তবে আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রাসূল (সা.)-কে ভালোবাসি। রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, তুমি তাঁর নৈকট্য অর্জন করবে। হযরত আনাস (রা.) বলেন, আমরা আর কোনো বিষয়ে এত খুশি হইনি রাসূল (সা.)-এর এই কথায় যে আনন্দ আমরা পেয়েছি। انت مع من احببت তোমাকে তার নৈকট্য অর্জিত হবে, যাকে তুমি মুহাব্বত করো। এই হাদীস বর্ণনা করে, হযরত আনাস (রা.) বলেন, আমি নবী করীম (সা.)-কে মুহাব্বত করি, হযরত আবু বকর ও উমর (রা.)-কে মুহাব্বত করি। আমার বিশ্বাস, এই মুহাব্বতের কারণে আমি তাঁদের নৈকট্য অর্জন করব। যদিও তাঁদের মতো আমল করতে না পারি।

এই অবস্থা সকল সাবাহায়ে কেরামের ছিল। হযরত আলী (রা.) বলেন, আমাদের মাঝে আমাদের মাতা-পিতা, সন্তান-সন্ততি, এমনকি এমন ঠাণ্ডা পানির চেয়েও রাসূল (সা.)-এর মুহাব্বত বেশি ছিল যে পানি আমাদের পিপাসা নিবারণের (সর্বশেষ) সম্বল। তাতের বহুবচন শব্দ ব্যবহার করায় বোঝা যায় তা থেকে সকল সাহাবীই উদ্দেশ্য। (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)

রাসূল (সা.)-এর প্রতি সাহাবায়ে কেরামের প্রগাঢ় মুহাব্বত ও ভালোবাসা সম্পর্কে হাদীসের কিতাবসমূহে হাজারো মর্মস্পর্শী ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। যা থেকে বোঝা যায় রাসূল (সা.)-এর প্রেম-ভালোবাসায় তাঁরা ছিলেন দুনিয়ার ইতিহাসে একক ব্যক্তিত্ব, অনন্য নজির। কোনো নবী-রাসূল কিংবা কোনো জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে এমন নজির পাওয়া যায় না।

সে কারণে সাহাবায়ে কেরাম রাসূল (সা.)-এর প্রতিটি বিষয়ে মুসলিম উম্মাহের জন্য নমুনা। সত্যের মাপকাঠি।

আমরা এ পর্যন্ত রাসূল (সা.)-এর মুহাব্বত ও ভালোবাসার আলোচনা করেছি। সর্বশেষ রাসূল (সা.)-এর প্রতি সাহাবায়ে কেরামের অনন্য ভালোবাসা ও মুহাব্বতের কিছু বিষয় তুলে ধরা হয়েছে।

এখানে একটি বিষয়ে ভিন্নভাবে আলোকপাত করা উচিত। হাদীস শরীফে এসেছে–

'রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, তুমি কিয়ামতের জন্য কী প্রস্তুতি করেছ? তিনি বললেন, কিছুই না। তবে আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রাসূল (সা.)-কে ভালোবাসি। রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, তুমি তাঁর নৈকট্য অর্জন করবে। হযরত আনাস (রা.) বলেন, আমরা আর কোনো বিষয়ে এত খুশি হইনি রাসূল (সা.)-এর এই কথায় যে আনন্দ আমরা পেয়েছি। انت مع من احببت তোমাকে তার নৈকট্য অর্জিত হবে, যাকে তুমি মুহাব্বত করো।'

এরূপ আরো বিভিন্ন হাদীসকে পুঁজি করে অনেকে বলে থাকেন, আমলের প্রয়োজন নেই বা আমল করে কেউ জান্নাতে যেতে পারবে না। বরং প্রয়োজন হলো রাসূল (সা.)-এর মুহাব্বত। রাসূল (সা.)-কে ভালোবাসলেই জান্নাতে রাসূল (সা.)-এর নৈকট্য অর্জন করবে। জান্নাতে প্রবেশ করবে।

এরূপ দাবির অসারতা সম্পর্কে বুঝতে হলে আমাদের সাহাবায়ে কেরামের প্রতি মনোনিবেশ করতে হবে। এই হাদীসগুলো সর্বপ্রথম সাহাবায়ে

কেরামের কাছেই পৌঁছেছিল। তাঁরাই এই সব হাদীসের সর্বপ্রথম সম্বোধিত ব্যক্তি। তাঁদের অবস্থা কী ছিল?

এমন কোনো সাহাবী কি পাওয়া যাবে, যিনি ইসলামের ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নাত আমল বাদ দিয়ে শুধু রাসূল (সা.)-এর মুহাববতের বুলি আওড়িয়েছেন? এমন কোনো সাহাবী কি পাওয়া যাবে, যাঁরা রিসালতের কথা বলতে গিয়ে তাওহীদকে অস্বীকার করেছেন? (নাউজু বিল্লাহ) সাহাবায়ে কেরামের শিক্ষা এমন ছিল না। ইসলামের যাবতীয় শিক্ষাতেও এরূপ কোনো বিষয় নেই। ফরয, ওয়াজিব এবং রাসূল (সা.)-এর সুন্নাতের খবর না রেখে শুধু রাসূল (সা.)-এর মুহাব্বত ও ভালোবাসার কথা বলা হবে, এমন কিছুর কল্পনাও ইসলামে নেই।

সাহাবায়ে কেরাম উল্লিখিত হাদীস সামনে থাকার পরও সমস্ত আমল করেছেন। ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নাত যা রাসূল (সা.) শিক্ষা দিয়েছেন তা সম্পূর্ণরূপে পালন করেছেন। এবং তাঁরা খুঁজেছেনে আরো কী আমল আছে। এমনকি রাসূল (সা.)-এর সুন্নাতে আদিয়া তথা মানুষের স্বভাবজাত বিষয়গুলোতেও রাসূল (সা.)-এর অনুসরণ ও অনুকরণ করার চেষ্টা করেছেন সাহাবায়ে কেরাম। এর মাধ্যমেই তাঁরা রাসূল (সা.)-এর ভালোবাসায় সিক্ত হয়েছেন। নিজেরাও রাসূল (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশের অভাবিত বিপ্লব ঘটিয়েছেন।

রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন,

فمن رغب عن سنتى فليس منى

"যে আমার সুন্নাত থেকে বিমুখ হবে সে আমাদের মধ্য হতে নয়।"

তাতে বোঝা যায়, ফরয, ওয়াজিব আমল করার সাথে সাথে রাসূল (সা.)-এর সুন্নাত ও আদর্শ অনুযায়ী জীবন যাপন করাই হলো রাসূল (সা.)-এর মুহাব্বত ও তাঁর দলভুক্ত থাকার পরিচয়। এসব বাদ দিয়ে রাসূল (সা.)-এর মুহাব্বত কল্পনাও করা যায় না। এসব বাদ দিয়ে রাসূল (সা.)-কে মুহাব্বত করার যত কথাই বলা হোক তা সঠিক অর্থে মুহাব্বত হবে না।

**সাহাবায়ে কেরাম ও রাসূল (সা.)-এর ইত্তিবা :**

রাসূল (সা.) কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ-নিষেধ মেনে চলা এবং তাঁর সুন্নাত মতে জীবন পরিচালনার নামই হলো ইত্তেবায়ে রাসূল (সা.)। সাহাবায়ে কেরামের ইত্তেবায়ে রাসূল সম্পর্কে জ্ঞাত হলেই বোঝা যাবে রাসূল (সা.) এর প্রতি মুহাববত প্রকাশের আসল পন্থা কী।

* হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) একদা রাসূল (সা.)-এর হাতে রুপার একটি আংটি দেখলেন। (অন্যরাও দেখলেন) তাই সবাই নতুন করে আংটি বানিয়ে ব্যবহার করতে লাগলেন। পরে রাসূল (সা.) আংটি ব্যবহার ছেড়ে দিলেন। সাথে সাথে সাহাবায়ে কেরামও আংটি পরা বন্ধ করে দিলেন। (বোখারী শরীফ)

* এক সাহাবী বলেন, আমি দেখলাম রাসূল (সা.) হাজরে আসওয়াদের পাশে দাঁড়িয়ে বললেন, আমি জানি তুমি পাথর। তুমি কোনো ক্ষতিও করতে পারো না, উপকারও করতে পারো না। অতঃপর রাসূল (সা.) হাজরে আসওয়াদে চুমু দিলেন।

হযরত আবু বকর (রা.) হজ পালন করে হাজরে আসওয়াদের পাশে দাঁড়ালেন। তিনিও রাসূল (সা.)-এর ন্যায় বললেন, আমি জানি তুমি পাথর। তুমি কারো উপকার করতে পারো না, ক্ষতিও করতে পারো না। আমি যদি রাসূল (সা.)-কে তোমাকে চুমু দিতে না দেখতাম তাহলে আমি দিতাম না। (কানযুল উম্মাল)

* হযরত সাআদ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.) বলেন, একদা হযরত হাফসা বিনতে উমর (রা.) হযরত উমর (রা.)-কে বলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! কতই না ভালো হতো যদি আপনি এরূপ মোটা কাপড়ের স্থলে নম্র কাপড় পরিধান করতেন। এর চেয়েও উত্তম খানা গ্রহণ করতেন। কারণ আল্লাহ তা'আলা আপনাকে অগণিত রিযিক দিয়েছেন। অর্থসম্পদও আল্লাহ তা'আলা আপনাকে কম দেননি। হযরত উমর (রা.) বলেন, তোমার কাছেই তোমার এই দাবির বিরুদ্ধে দলিল আছে। তুমি কি রাসূল (সা.)-এর কষ্টপূর্ণ-অনাড়ম্বর জীবনযাপন দেখোনি? হযরত উমর (রা.) তাঁকে রাসূল (সা.)-এর কিছু ঘটনা উল্লেখ করছেন। হযরত হাফসা অশ্রুসিক্ত হলেন। হযরত উমর বললেন, আমি যথাসম্ভব রাসূল (সা.) ও হযরত আবু বকর (রা.)-এর ন্যায় অভাব-অনটনের জীবন যাপন করব। যাতে আখেরাতে এই দুই মহান ব্যক্তির মতোই জীবন আমার অর্জিত হয়। (তাবকাতে ইবনে সাআদ, হিলয়াতুল আওলিয়া)

* মক্কা ও মদীনা শরীফের মধ্যবর্তী স্থানে একটি গাছের নিচে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলেন। এর কারণ হিসেবে বললেন, এই গাছের নিচে রাসূল (সা.) বিশ্রাম নিয়েছিলেন। (আততারগীব ওয়াত তারহীব)

* হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) যখনই রাসূল (সা.)-এর কথা বলতেন, কেঁদে দিতেন। যখন মক্কায় নিজের ঘরের পাশ দিয়ে যেতেন চোখ বন্ধ করে রাখতেন। (আততারগীব ওয়াত

তারহীব)

* হযরত ইবনে সীরীন (রহ.) বলেন, আমি আরাফার ময়দানে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমরের সাথে ছিলাম। যখন তিনি বের হলেন আমিও বের হলাম। তিনি ইমামুল হজের স্থানে পৌঁছলেন, জোহর ও আসরের নামায আদায় করলেন। এরপর জাবালে রহমতে অবস্থান করলেন। আমি এবং সাথি-সঙ্গীগণও সাথে চলতে থাকলেন। সূর্যাস্তের পর যখন মুযদালিফার দিকে রওনা হলেন আমরাও সাথে চললাম। মাযমিন স্থানের সামান্য আগে একটি জায়গায় পৌঁছার পর হযরত ইবনে উমর (রা.) সওয়ারীকে থামালেন। আমরা থেমে গেলাম। আমরা মনে করছিলাম তিনি হয়তো নামায আদায় করার ইচ্ছা করেছেন। হযরত ইবনে উমরের গোলাম বললেন, না তিনি নামায পড়ার জন্য নয় বরং এই স্থানে পৌঁছে হঠাৎ তাঁর অন্তরে রাসূল (সা.)-এর কথা ভেসে এল। কারণ এই স্থানে পৌঁছে রাসূল (সা.) হাজত সারার জন্য থেমে ছিলেন। সেই অনুকরণে হযরত ইবনে উমর (রা.)ও এখানে থেমেছেন। (আততারগীব ওয়াত তরাহীব)

হযরত ইবনে উমর (রা.)-এর এরূপ অসংখ্য ঘটনা রয়েছে। মূলত তিনি সব বিষয়ে রাসূল (সা.)-এর অনুকরণ ও অনুসরণের চেষ্টা করতেন। তাঁকে নবীজীবনের প্রতিবিম্বও বলা হয়ে থাকে। শুধু ইবাদতে নয় বরং রাসূল (সা.)-এর মানবিক স্বভাবগত সব বিষয়েই তিনি হুবহু অনুসরণ করতেন।

সাহাবায়ে কেরামের এরূপ অসংখ্য ঘটনা থেকে এ কথা স্পষ্ট হয় যে তাঁরা রাসূল (সা.)-কে কিভাবে ভালোবাসতেন এবং কিভাবে ভালোবাসা প্রকাশ করতেন। তাঁরা কিছু মুহাব্বত মুহাব্বত বলে বুলি আউড়িয়েই জীবন যাপন করতেন নাকি দ্বীনের চাহিদা এবং রাসূল (সা.)-এর পূর্ণ অনুসরণ-অনুকরণের মাধ্যমে রাসূল (সা.)-এর মুহাব্বত প্রকাশের তাগাদা পূরণ করতেন?

**সলফে সালেহীনের কিছু বাণী :**

* হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহ.) বলেন, সুন্নাতের বিপরীত চলে শান্তি অর্জন করা যাবে না এবং আল্লাহ তা'আলাকে নারাজ করে মখলুরেক সন্তুষ্টি অর্জন করা যাবে না। (রাওজাতুল খুতাবা)

* হযরত যুননুনে মিসরী (২৪৫ হি.) বলেন, আল্লাহ তা'আলার মুহাব্বতের আলামত হলো, স্বভাব-চরিত্র, আমল-আখলাক এবং সমস্ত কাজে রাসূল (সা.)-এর সুন্নাতের ইত্তিবা করা। (ছমরাতুল আওরাক)

* হযরত তাস্তারী (রহ.) (২৮৩ হি.) বলেন, বান্দা যেকোনো আমল রাসূল (সা.)-এর অনুকরণ ব্যতীত করবে হোক, তা নেক আমলের মতো তা হবে নিজের খাহেশ পূরণ। আর যে কাজ রাসূল (সা.)-এর অনুসরণে করে তাতে নফসের অস্বীকৃতি থাকে এবং কষ্ট হয়। আমাদের উদ্দেশ্য হলো খাহেশাতের ইত্তিবা থেকে বেঁচে থাকা। (ছামারাতুল আওরাক)

তাঁর কাছে কেউ জিজ্ঞেস করলেন, উচ্চ মনমানসিকতা কী? উত্তরে তিনি বললেন, ইত্তিবায়ে সুন্নাত। (প্রাগুক্ত)

* ইমাম মালেক (রহ.) একদা হাদীসের দরস দিচ্ছিলেন। দরস দানকালীন ছাত্ররা প্রত্যক্ষ করছেন, তাঁর চেহারা পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। বারবার চেহারায় কষ্টের চিহ্ন ফুটে উঠছে। কিন্তু তিনি দরস দান বন্ধ করছেন না। হাদীস পড়ানোর ক্ষেত্রে কোনো প্রকার ব্যতিক্রমও হচ্ছে না। দরস শেষে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার শারীরিক অবস্থা কি খারাপ? তিনি বললেন, হাদীসের দরসদানের সময় আমাকে অন্তত ১০ বার বিচ্ছু দংশন করেছে। অতঃপর বললেন, আমি যে স্থির ছিলাম তা আমার সাহসিকতা বা ইস্তিকামতের জন্য নয় বরং একমাত্র রাসূল (সা.)-এর হাদীসের সম্মানার্থেই করেছি। (হায়াতে ইমাম মালেক)

* ইমাম আহমদ (রহ.)-এর আস্তাবলে অনেক ঘোড়া এবং খচ্চর ছিল। কিন্তু তিনি কোনো সময় মদীনার অলিগলিতে সওয়ারীর ওপর চড়েননি। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, যে পবিত্র স্থানে রাসূল (সা.)-এর কদম মোবারক পড়েছে সে স্থান সওয়ারীর পা দ্বারা দলিত হবে আমি তার ওপর বসে থাকব, তা কখনো হয় না। (প্রাগুক্ত)

অসংখ্য বাণী ও ঘটনার মধ্যে কয়েকটি নমুনাস্বরূপ উল্লেখ করা হলো। এই আলোচনা থেকে বোঝা যায়,

১। রাসূল (সা.)-কে মুহাব্বতকারীদের কাতারে সর্বপ্রথম কাতার হলো সাহাবায়ে কেরামের। তাঁরাই পুরো মুসলিম উম্মাহের নমুনা। এককথায় তাঁরা রাসূল (সা.)-এর প্রদর্শিত পথে হুবহু চলার মাধ্যমেই রাসূল (সা.)-এর ভালোবাসা ও মুহাব্বত প্রকাশ করতেন। বরং স্বভাবজাত বিষয়গুলোতেও রাসূল (সা.)-এর অনুকরণ করার চেষ্টা করতেন।

২। সলফে সালেহীনগণও উম্মতকে এ কথা শিক্ষা দিয়েছেন যে রাসূল (সা.)-এর মুহাব্বত প্রকাশের প্রধান ধাপ হলো ইত্তিবায়ে রাসূল (সা.)। অর্থাৎ জীবনের প্রতিটি বিষয়ে রাসূল (সা.)-এর অনুসরণ-অনুকরণ করা। সুন্নাতী জীবনযাপনের অভ্যাস গড়ে তোলা।

(সমাপ্ত)

# জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান

## কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা বাংলাদেশ

পরিচালনায় : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ, বসুন্ধরা, ঢাকা।

**প্রসঙ্গ : চাঁদা-সদকা**

মাওলানা মুনিরুল ইসলাম
সিরাজদিখান, মুন্সীগঞ্জ।

**জিজ্ঞাসা :**

আমাদের মহল্লার মসজিদ ও মাদরাসার পরিচালনা কমিটি একই। কিন্তু মসজিদ ও মাদরাসার অ্যাকাউন্ট ভিন্ন ভিন্ন। আর মসজিদের মুয়াজ্জিন ও খাদেমগণ মাদরাসার বিভিন্ন কাজে সহযোগিতা করেন। যেমন রসিদের মাধ্যমে মাদরাসার দান-অনুদান গ্রহণ করা এবং সেটা ব্যাংকে জমা করা ইত্যাদি। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি লক্ষ রাখা। এখন আমার জানার বিষয় হলো, মসজিদের মুয়াজ্জিন ও খাদেমদের জন্য উক্ত সুরতে মাদরাসার খানা-টাকা দিয়ে বা ফ্রি খাওয়া জায়েয হবে কি না? অনুরূপভাবে এতিম-অসহায়দের জন্য মাঝে মাঝে সদকা ইত্যাদির উদ্দেশ্যে যে ছাগল আসে তা তাঁদের জন্য খাওয়া হালাল হবে কি না?

**সমাধান :**

প্রশ্নোক্ত মসজিদ যদি মাদরাসার অধীনে পরিচালিত হয়, তাহলে শরয়ী দৃষ্টিতে উক্ত মসজিদের ইমাম, মুয়াজ্জিন ও খাদেমদের জন্য মাদরাসার সাধারণ চাঁদার ফান্ড থেকে খানা খাওয়া বৈধ হবে। অনুরূপভাবে মসজিদটি মাদরাসার অধীনে না হয়ে এলাকাভিত্তিক হওয়া সত্ত্বেও যদি মাদরাসা কর্তৃপক্ষ তাদেরকে উক্ত কাজের জন্য নিয়োগ দেয়, তখনও সাধারণ চাঁদার ফান্ডের খানা খাওয়া বৈধ হবে। তবে গোরাবা ফান্ড থেকে তাদেরকে খানা খাওয়ানো বৈধ হবে না। আর গরিব-অসহায় ছাত্রদের জন্য সদকা ইত্যাদির উদ্দেশ্যে যে ছাগল আসে, তা যদি নফল সদকা হয় তাহলে তা থেকে সবাই খেতে পারবে। তবে যদি সেটা ওয়াজিব বা মান্নতের সদকা হয় তাহলে যাকাতের উপযুক্ত ব্যক্তি ছাড়া খেতে পারবে না। (আদ দূররুল মুখতার-১/৩৮০, বাহরুর রায়েক-২/২৪৫, ফাতাওয়ায়ে কাসেমিয়া-১৯/১৫৩)

**প্রসঙ্গ : অর্থের চুক্তির ভিত্তিতে ওয়াজ**

মুহাম্মদ রাশেদুল ইসলাম
কালিয়াকৈর, গাজীপুর।

**জিজ্ঞাসা :**

কন্ট্রাক করে ওয়াজ মাহফিল করা যাবে কি না? কয়েক দিন আগে আমাদের কিছু সংখ্যক আলেমদের মাঝে তর্ক-বিতর্ক হয়েছে, কন্ট্রাক করে ওয়াজ মাহফিল করা জায়েয কি না। কেউ জায়েযের পক্ষে, কেউ বিপক্ষে। এমন পরিস্থিতিতে আমি তাদের মাঝে উপস্থিত হলাম তখন তারা আমাকে জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু এই বিষয়ে আমার জানা না থাকায় তাদের কিছু বলতে পারিনি। তখন তারা এ বিষয়ে বসুন্ধরা মারকাযের ফতওয়া জানতে আগ্রহী হলো।

তাই উল্লিখিত বিষয়টি কোরআন-সুন্নাহ মোতাবেক এবং বর্তমান মুফতিয়ানে কেরামদের মতসহ জানালে শুকর গুজার হতাম।

**সমাধান :**

ওয়াজকে যারা পেশা হিসেবে গ্রহণ করে তাদের জন্য কন্ট্রাক করে টাকা নিয়ে ওয়াজ মাহফিল করা বৈধ। তবে ওয়াজ-নসীহত এবং দাওয়াতের কাজ বিনিময়বিহীন হওয়া নবী করীম (সা.)-এর আদর্শ। (আদ দূররুল মুখতার-৬/৫৫, ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া-১১/৩২০)

**প্রসঙ্গ : মিরাছ**

মুহাম্মদ মুজাহিরুল ইসলাম
তারাকান্দা, মোমেনশাহী।

**জিজ্ঞাসা :**

আমার নানির মৃত্যুর পর আমার নানা একটি জমি বিক্রি করেছে। যে জমিটি কাগজেপত্রে আমার নানির ছিল। জমি বিক্রয়ের সময় তার ছেলেমেয়েরা নাবালেগ ছিল। যার কাছে বিক্রি করেছে সে জানত এবং গ্রামের লোকেরা জানত, জমির মালিক আমার নানা নয়, আমার নানি। তা সত্যেও ক্রেতা আমার নানাকে টাকার লোভ-লালসা দেখিয়ে কিনে নেয়। যখন ছেলেমেয়েরা বড় হয় এলাকার লোকেরা তাদেরকে জানায় এখানে তোমাদের জমি আছে। তারা তথ্য নিয়ে জানতে পারে তাদের মায়ের জমি তাদের পিতা বিক্রি করে ছিল, আমরা জানি, একজনের মালিকানা সম্পদ অপরজন বিক্রি করলে বিক্রি সহীহ হয় না। তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি জমিটি ফিরিয়ে আনার জন্য। কিভাবে ফিরিয়ে আনতে পারব। ফিরিয়ে আনলে নানার আখেরাতে কোনো সমস্যা হবে কি না? যেহেতু আমার নানা মৃত্যুবরণ করেছে। ইসলামী শরীয়

অনুযায়ী সমাধান চাই।

**সমাধান :**

পিতা যদি অসৎ হিসেবে প্রসিদ্ধ না হয়, তাহলে সন্তানদের প্রয়োজনে তাদের জমি বিক্রি করার অধিকার রাখে। তাই প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় আপনার নানা অসৎ হিসেবে প্রসিদ্ধ না হয়ে থাকলে এবং সন্তানদের প্রয়োজনে জমি বিক্রি করে থাকলে উক্ত বিক্রয় কার্যকর হয়ে গেছে। তা ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার নেই। পক্ষান্তরে আপনার নানা অসৎ হিসেবে প্রসিদ্ধ হলে অথবা বিনা প্রয়োজনে বিক্রি করেছে বলে প্রমাণিত হলে শুধুমাত্র তার অংশ তথা এক-চতুর্থাংশে বিক্রি সহীহ হয়েছে। বাকি অংশ অন্য ওয়ারিশদের জন্য যথাযথ প্রক্রিয়ায় ফিরিয়ে নেওয়ার সুযোগ আছে। (আদদুররুল মুখতার-৬/৭২৬, ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া-৩/১৭৪)

**প্রসঙ্গ : ওয়াক্ফ**

মাদরাসা কর্তৃপক্ষ।

**জিজ্ঞাসা :**

একটি মাদরাসার সাথে এক ব্যক্তির মালিকানাধীন একটি পুকুর আছে, মাদরাসার সুবিধার জন্য পুকুরটার খুবই প্রয়োজন, পুকুরের মালিক মাদরাসার নামে ওয়াক্ফকৃত অন্য একটি জমির সাথে বদল করার প্রস্তাব দিয়েছে। তার এই প্রস্তাব গ্রহণ করে ওয়াক্ফকৃত জমি দিয়ে পুকুর নেওয়া যাবে কি না? এর ফয়সালা জানতে চাই।

**সমাধান :**

ওয়াক্ফ করার সময় ওয়াক্ফকারী যদি পরবর্তীতে ওয়াক্ফকৃত জমি প্রয়োজনে পরিবর্তনের অনুমতি প্রদান না করে থাকেন এবং বর্তমানে উক্ত জমি থেকে যেকোনোভাবে উপকৃত হওয়া সম্ভবপর হয় তাহলে তা পরিবর্তন করা শরয়ী দৃষ্টিতে বৈধ হবে না। তাই প্রশ্নোক্ত অবস্থায় মাদরাসার নামে ওয়াক্ফকৃত জমি থেকে উপকৃত হওয়ার ব্যবস্থা থাকাবস্থায় তা দিয়ে পুকুর পরিবর্তন করা যাবে না। (রদ্দুল মুহতার-৪/৩৮৪, ফতহুল কৃদির-৬/২১২, বাহরুর রায়েক-৫/৩৪৫)

**প্রসঙ্গ : নারী শ্রমিক**

মুহাম্মদ আব্দুল গফুর
গুলশান, ঢাকা।

**জিজ্ঞাসা :**

(টেক্সটাইল প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রিজ লি. একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান, কাপড়ের ফ্যাক্টরি) ইহাতে ডায়িং, প্রিন্টিং, প্রসেসিং ইত্যাদির কাজ করা হয়। বর্তমানে অত্র প্রতিষ্ঠানে পুরুষ শ্রমিকের অভাবে উৎপাদনে বিঘ্ন হচ্ছে এবং মাল নষ্ট হচ্ছে ইহাতে আমাদের মাসিক উৎপাদনের হার কমে গেছে, আগামী ২ মাস পর রমযানের ঈদ। ঈদের আগে শ্রমিক-কর্মচারী বেতন, বোনাস বিরাট অংকের টাকা পরিশোধ করতে হবে বর্তমান পুরুষ শ্রমিক পাওয়া যাচ্ছে না। পুরুষ শ্রমিক আসে কিন্তু চলে যায়। ফলে কিছু মেশিন প্রায়ই বন্ধ থাকে। এ কারণে উৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটে এবং কাস্টমারের সমস্যা হয়, পাওনাদাররা আমাদের চাপ সৃষ্টি করবে। আমাদের পাশের প্রতিষ্ঠান নারী শ্রমিক নিয়োগ দিয়েছে। কারণ নারী শ্রমিকরা পুরুষের তুলনায় কাজের দিক দিয়ে সার্ভিকভাবে এগিয়ে এবং সরকারিভাবে নারী শ্রমিক রাখার একটা কানুনও আছে। এমতাবস্থায় আমাদের জন্য শরীয়তের দৃষ্টিতে করণীয় কী?

**সমাধান :**

পুরুষ শ্রমিক রাখতে সক্ষম না হলে মহিলা শ্রমিক রাখা যাবে। তবে মহিলাদের জন্য সম্পূর্ণ পৃথক ফ্লোর বা পৃথক রুমে কাজ করার ব্যবস্থা করতে হবে এবং তাদের দেখাশোনার জন্য মহিলা অফিসার নিয়োগ দিতে হবে সেখানে কোনো পুরুষ যাবে না। এভাবে পর্দা রক্ষা করে মহিলাদের কাজের পরিবেশ তৈরি করা হলে মহিলা শ্রমিক নিয়োগ দেওয়া যাবে। (সূরা আহযাব-৫৯, আহকামুল কোরআন-৩/৪৭৫, ফাতাওয়ায়ে রহিমিয়া-৩/১৬৯)

**প্রসঙ্গ : মসজিদ**

আলহাজ আবু বকর ছিদ্দিক
রশিদাবাদ, সিরাজগঞ্জ।

**জিজ্ঞাসা :**

একটি পাকা মসজিদের সাথে হিংসাহিংসী, রেষারেষি করে পাশেই আরেকটি টিনের ছাপরা তুলে মসজিদ বানিয়ে যদি নামায পড়ার ব্যবস্থা করা হয় উক্ত নতুন মসজিদে যত মুসল্লি নামায আদায় করবে তার সাওয়াব নাকি পুরাতন মসজিদের প্রতিষ্ঠাকারীই পাবে? ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে উক্ত কথাটি সঠিক কি না? জানিয়ে বাধিত করবেন।

**সমাধান :**

হিংসাহিংসী ও রেষারেষি করে মসজিদ নির্মাণ করার দ্বারা নির্মাতাদের কোনো সওয়াব তো হবে না, বরং গোনাহ হওয়ার আশঙ্কা আছে। তবে এটি শরয়ী মসজিদ বলেই বিবেচিত হবে। আর প্রশ্নে বর্ণিত উক্তিটি (অর্থাৎ উক্ত নতুন মসজিদে যত মুসল্লি নামায আদায় করবে তার সওয়াব পুরাতন মসজিদ প্রতিষ্ঠাকারীই পাবে) ভিত্তিহীন, সওয়াব তো প্রত্যেক মুসল্লিই পাবে। (বোখারী শরীফ-১/৬৪, ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম দেওবন্দ-২/৬৭২)

**প্রসঙ্গ : মুসাফির**

মুস্তফা কামাল
মতলব, চাঁদপুর।

**জিজ্ঞাসা :**

(ক) সামুদ্রিক পথে কত কিলোমিটার দূরত্বে সফর করলে মুসাফির বলে গণ্য হবে?

(খ) এবং পাহাড়ি অঞ্চলে কত কিলোমিটার দূরত্বে সফর করলে মুসাফির বলে গণ্য হবে? দয়া করে দলিলসহ জানালে কৃতজ্ঞ হব।

**সমাধান :**

(ক-খ) শরয়ী দৃষ্টিতে স্থলপথে মুসাফির সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে মাইল কিলোমিটার ধর্তব্য হলেও সামুদ্রিক পথে ও পাহাড়ি পথে মুসাফির হওয়ার জন্য তা ধর্তব্য নয়। বরং সামুদ্রিক পথে মধ্যম গতিতে চলে এমন নৌযান ও পাহাড়ি পথে মধ্যম গতিসম্পন্ন ব্যক্তি উভয়টির তিন দিনের দূরত্বের পরিমাণই ধর্তব্য হবে, যা স্থান-কাল-পাত্র হিসেবে বেশকম হতে পারে। তবে এসব রাস্তায় উড়োজাহাজ বা হেলিকপ্টারে ভ্রমণকালে ৪৮ মাইল দূরত্ব ধর্তব্য হবে। (বাহরুর রায়েক-১/২২৯, ফাতাওয়ায়ে শামি-২/১৩২, মসায়েলে সফর-৮২)

**প্রসঙ্গ : তারাবীর বিনিময়**

মুহাম্মদ সালাহ উদ্দিন
কালীগঞ্জ, সাতক্ষীরা।

**জিজ্ঞাসা :**

আমি একটি মসজিদে তারাবীহ পড়াই, নিয়োগ দেওয়ার সময় আমাকে ইমাম হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। এ সুবাদে আমাকে ইমাম শবে বরাতের পর থেকে ২-১ দিন করে ওয়াক্তিয়া নামায পড়াতে হয়। ইমাম ও খতীব সাহেবসহ আমরা চারজনে তারাবীহ পড়াই কোনো রকম কালেকশন করা ব্যতীত মসজিদ ফান্ড থেকে সবাইকে সমান হারে হাদিয়া দেওয়া হয়। এখন আমার জানার বিষয় হলো :

১। এভাবে তারাবীহ পড়ালে হাদিয়া নেওয়া/দেওয়া বৈধ হবে কি?

২। মসজিদের ফান্ড থেকে ইমাম সাহেবকে ঈদ উপলক্ষে বোনাস দেওয়া হয় আমাকেও বোনাস দিতে পারবে কি?

**সমাধান :**

খতমে তারাবীহ পড়িয়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ নয়। এ ক্ষেত্রে কোনো ধরনের হিলা বাহানার অবকাশ নেই। বিধায় প্রশ্নে বর্ণিত ইমামতির হিলার দরুন খতমে তারাবীহের পারিশ্রমিক বৈধ হবে না। (আদ দূররুল মুখতার-৬/১৫৫, ফাতাওয়ায়ে হামেদিয়া-২/১৩৮, ফাতাওয়ায়ে রহিমিয়া-৪/৩৮৮)

**প্রসঙ্গ : মাজুরের ইমামতি**

মুহাম্মদ সোহাইল আহমদ
কালীগঞ্জ, গাজীপুর।

**জিজ্ঞাসা :**

আমি একটি মসজিদে দীর্ঘ বারো বছর যাবৎ ইমামতি করি। হঠাৎ একটি সিএনজি দুর্ঘটনায় আমি মারাত্মক আহত হই। ফলে আমার ডান হাতটি তার নিজ জোড়া থেকে পৃথক হয়ে যায়। চিকিৎসা করার পর ডাক্তার আমাকে ছয় মাস বিশ্রামে থাকতে বলে। এমতাবস্থায় আমি মসজিদ থেকে চার মাসের ছুটি নিই। উল্লেখ্য, এখন আমার হাতটি ডাক্তারি ব্যাগের মাধ্যমে বাঁধা, যার দ্বারা আমি রুকু-সিজদা করতে পারি না। তবে যদি অপর একটি কাপড় বা রশির মাধ্যমে হাতটি বাঁধা হয় তাহলে সহজে রুক-সিজদা করতে পারি। আমার জানার বিষয় হলো, এভাবে এক হাত বেঁধে নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ইমামতি করা বৈধ হবে কি না?

এ ক্ষেত্রে মুসল্লিদের নামাযের কোনো সমস্যা হবে কি না? জানিয়ে বাধিত করবেন।

**সমাধান :**

প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে এক হাত বাঁধা অবস্থায় রুকু-সিজদা করে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ইমামতি করা বৈধ। এতে মুসল্লিদের নামাযে কোনো সমস্যা হবে না। (রদ্দুল মুহতার-১/৫৬২, কিতাবুন নাওয়ায়েল-৪/৩৫৮)

**প্রসঙ্গ : সরওয়ারে কায়েনাত**

এ কে এম মাহমুদ
মিরপুর, ঢাকা।

**জিজ্ঞাসা :**

সরওয়ারে কায়েনাত, আকায়ে নামদার, তাজেদারে মদীনা, হযরত আহমদে মোস্তফা, মোহাম্মদ মজতবা-এর অর্থ কী? এটা কি আল্লাহর রাসূলের শানে বলা যাবে কি না?

**সমাধান :**

প্রশ্নে বর্ণিত কথাটির অর্থ হলো, সৃষ্টি জগতের সর্দার স্বনামধন্য মনিব, মদীনার বাদশাহ, নির্বাচিত ও মনোনীত নবী হযরত মুহম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। এবং এ কথাটি রাসূল (সা.)-এর শানে বলা যাবে। (সূরা আলে ইমরান-৩৩, মুসনাদে আহমদ-১/৫)

**প্রসঙ্গ : কল্যাণ ফান্ড**

মুহাম্মদ নাছির উদ্দিন
আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

**জিজ্ঞাসা :**

আমি সারকারখানায় চাকরি করি। সেটি একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান। সেখানে একটি কল্যাণ ফান্ড রয়েছে, যা থেকে

কোনো চাকরিজীবীর মেয়ের বিবাহ বা কেউ অসুস্থ হলে সহযোগিতা করা হয়। এবং প্রত্যেক চাকরিজীবীকে ৫০,০০০ টাকা করে ঋণ দেওয়া হয় এবং তিন বছরে এই ৫০,০০০ টাকা তাদের বেতন থেকে কেটে নেওয়া হয় এবং অতিরিক্ত ৪০০০ টাকা বেতন থেকে কেটে নেয়। অর্থাৎ ৫০,০০০ টাকা ঋণ দিয়ে ৫৪,০০০ টাকা তিন বছরে কেটে নেওয়া হয়। আমার প্রশ্ন, বর্ণিত অবস্থায় এই কল্যাণ ফান্ড থেকে ঋণ নেওয়া জায়েয হবে কি না? জানালে উপকৃত হব।

এই ফান্ডের মালিক কোনো ব্যক্তি নয় বরং সরকারই এই ফান্ডের মালিক। বিকল্প কোনো পন্থা থাকলে জানালে উপকৃত হব।

**সমাধান :**

প্রশ্নের বর্ণনা মতে, উক্ত কল্যাণ ফান্ড থেকে ঋণ নেওয়ার পদ্ধতি সুদভিত্তিক হওয়ায় তা বৈধ নয়। কল্যাণ ফান্ডের উদ্দেশ্য যেহেতু সহযোগিতা করা, তাই বিকল্প হচ্ছে সুদমুক্ত করযে হাসানা প্রদান। (সূরা আলে ইমরান-১৩, সূরা বাকারাহ-২৭৫৪, বাহরুর রায়েক-৬/২০৭)

**প্রসঙ্গ : শার্ট পরিহিত অবস্থায় নামায**

মুহাম্মদ হাসান

সিরাজগঞ্জ।

**জিজ্ঞাসা :**

আমাদের মসজিদে কয়েক দিন ধরে শার্ট পরিহিত অবস্থায় নামায পড়া নিয়ে এক ধরনের বিতর্ক চলছে, তাই আমাদেরকে শার্ট পরে নামায পড়ার শরয়ী বিধান সম্পর্কে অবগত করে বাধিত করবেন।

**সমাধান :**

ফুল হাতা বা হাফ হাতা যেকোনো পোশাক পরে নামায পড়লে নামায আদায় হয়ে যাবে। তবে বিনা প্রয়োজনে কনুই খোলা রেখে নামায পড়া মাকরূহ। বিধায় ফুল হাতা পোশাক থাকাবস্থায় হাফ হাতা শার্ট বা গেঞ্জি যা পরে সম্ভ্রান্ত লোক সমাজে যাওয়াকে দোষণীয় মনে করা হয়, এমন পোশাক পরে নামায পড়লে নামায আদায় হয়ে গেলেও মাকরূহ হবে। (আদদুররুল মুখতার-১/৬৪০, কিফায়াতুল মুফতী-৪/৪৫১, আহসানুল ফাতাওয়া-৩/৪০৭)

**প্রসঙ্গ : মসজিদ**

মুহাম্মদ শফিউদ্দিন

আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা।

**জিজ্ঞাসা :**

আমাদের গ্রামে আমাদের পারিবারিক জমিতে একটা একতলা মসজিদ ছিল। নিজ খরচে ওই একতলার ওপরে দ্বিতীয় তলা করেছি। ওই দোতলাতে আপাতত মাদরাসা শুরু করা হবে। আগামী মাস থেকে ইনশাআল্লাহ মসজিদের খরচের জন্য আমরা এবং গ্রামের অন্য একজন মোট ১ একর ১১ শতক জমি দিয়েছে। আমার চাচি ১৪ শতক ধানি জমি মসজিদকে দান করার নিয়্যাত করেন, আমি জানতে পেরে আমার চাচিকে অনুরোধ করি ওই ১৪ শতক জমি মসজিদকে না দিয়ে মাদরাসার এতীমখানার নামে দান করার জন্য। আমার চাচি সাথে সাথেই রাজি হয়ে যান। জমি এখনো দেওয়া হয়নি কোথাও, আমার চাচি ১৪ শতক ধানি জমি মসজিদের পরিবর্তে মাদরাসার এতীমখানার মাঝে দান (ওয়াক্ফ) করতে পারবেন কি না? তা জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

**সমাধান :**

শরীয়তের দৃষ্টিতে কেবলমাত্র নিয়্যাত করার দ্বারায় উক্ত জমিটি মসজিদের পরিবর্তে মাদরাসার এতীমখানায় ওয়াক্ফ করতে পারবেন।

উল্লেখ্য, মসজিদ হয়ে যাওয়ার পর তার ওপর-নিচ পুরোটাই মসজিদ হিসেবে গণ্য হবে। তার কোনো অংশকে স্থায়ীভাবে মাদরাসা করার অনুমতি নেই। তবে প্রয়োজনে অস্থায়ীভাবে দ্বীনি শিক্ষার কর্মকাণ্ড চালাতে পারবে এবং দ্রুত অন্যত্র স্থানান্তর করার ব্যবস্থাও করতে হবে। (আদ দুররুল মুখতার-১/৩৭৭, কিতাবুন নাওয়াযেল-১৩/১২৯, ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া-১০/৩৩৩)

**প্রসঙ্গ : ঈদের নামায**

মুহাম্মদ বদিউল আলম

জামে মসজিদ কমিটি, ঢাকা।

**জিজ্ঞাসা :**

অত্র মসজিদের সম্মানিত ইমাম সাহেব পবিত্র ঈদুল ফিতর ২০১৭ইং-এর নামাযে তাকবীরে তাহরীমার পর ৬ তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাক'আতে রুকুর পূর্বে অতিরিক্ত ৬ তাকবীরসহ বেখেয়ালে অতিরিক্ত মোট ১২ তাকবীরে জামাআত সমাপ্ত করেন। আমাদের উক্ত নামায আদায় হয়েছে কি না? মুসল্লিদের মনের সংশয় নিরসনকল্পে বিস্তারিতভাবে শরঈ সমাধান জানতে চই। অতএব হুজুরের সমীপে আবেদন, উপযুক্ত বিষয়ে শরঈ সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

**সমাধান :**

আপনাদের উক্ত নামায আদায় হয়ে গেছে। ভুলক্রমে ৬ তাকবীরের অধিক অতিরিক্ত তাকবীর বলার কারণে নামাযে কোনো সমস্যা হয়নি। তবে আগামীতে এ ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। (আদ দুররুল মুখতার-৩/৬১, মাআরিফুস সুনান-৪/৪৪০, ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম-৪/৪০৭)

# ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস-১৮

মাওলানা রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী

**আল্লাহ তা'আলা নিরাকার এবং সর্বত্র বিরাজমান ৮ :**

**২. আল্লাহ তা'আলার বিশেষণ বিষয়ে তাবীল তথা ব্যাখ্যা :**

আল্লাহ তা'আলার বিশেষণের ব্যাপারে সলফে সালেহীনের দুটি পদ্ধতির কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। তার মধ্যে তাফবীজের ব্যাপারে গত কিস্তিতে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো তাবীল বা ব্যাখ্যা। প্রয়োজনে আল্লাহ তা'আলার বিশেষণগুলোর এমন একটি অর্থ করা, যা দ্বারা বিশেষণের আকীদার ক্ষেত্রে সহজে শিরিক থেকে বাঁচা যায়। বিশেষ করে যাঁরা দ্বীনি ইলমে পারদর্শী নন, যাঁরা একেবারেই দ্বীনি ইলমের সাথে সম্পর্ক রাখেন না তাঁদের জন্য এসব তাবীল অত্যাবশ্যক। কারণ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বিশেষণগুলো থেকে শাব্দিক ও বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করে যদি সেগুলোকেই উদ্দেশ্য নেওয়া হয় তবে আল্লাহ তা'আলাকে সৃষ্টির সাথে তুলনা করা হয়, যা আকীদার ক্ষেত্রে শিরিক। যারা দ্বীনি ইলম সম্পর্কে অজ্ঞ এসব সিফাত সম্পর্কে যাদের ন্যূনতম জ্ঞান নেই তারা যদি আল্লাহ তা'আলার বিশেষণের আয়াতগুলো পাঠ করে এবং অর্থ করে তবে তাদের কাছে শাব্দিক ও বাহ্যিক অর্থ করা ছাড়া উপায় থাকে না। কারণ এসব বিষয়ে বিশ্লেষণ তাদের জানা নেই। সুতরাং এসব বিশেষণের বাহ্যিক অর্থকেই উদ্দেশ্য করা ছাড়া তাদের আর কোনো উপায় থাকে না। এসব বাহ্যিক অর্থ পাঠ করে তারা সাধারণভাবেই মনে করে নেবে সৃষ্টির মতোই আল্লাহ তা'আলার হাত-পা আছে। সৃষ্টির মতোই আল্লাহ তা'আলা আরশে বসে আছেন। (নাউজু বিল্লাহ) এমনিভাবে তাদের মধ্যে বাতিল আকীদা সৃষ্টি হবে এবং শিরিক কুফরে পতিত হবে। এরূপ ভয়ঙ্কর আকীদা থেকে সাধারণ মুসলমানদের রক্ষা করার জন্য সলফে সালেহীনগণ বিশেষণের এমন তাবীল বা ব্যাখ্যা করেছেন, যাতে তারা শিরিকী আকীদা থেকে মুক্ত থাকে। সলফে সালেহীনের প্রায় তাফসীর গ্রন্থেই আল্লাহ তা'আলা বিশেষণগুলোকে তাবীল সহকারে অর্থ করা হয়েছে।

সম্প্রতি কিছু মহল এরূপ তাবীল বা ব্যাখ্যাকে বিদ'আত বলে প্রচার করে মুসলিম উম্মাহে নতুন করে বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করছে। অথচ তাবীলের এই রীতিটি বর্তমান জামানার সাধারণ আলেম-উলামারা আবিষ্কার করেননি। বরং সাহাবায়ে কেরাম থেকে আরম্ভ করে সলফে সালেহীনের অধিকাংশ তাফবীজের সাথে সাথে তাবীলকেও গ্রহণ করেছেন। একসময় তাফবীজের রীতিটা সলফে সালেহীনের মাঝে ব্যাপক আকারে ছিল। যখন মুসলমানদের মাঝে ইলমী দৈন্যতা আসে, ধর্মবিমুখতা বৃদ্ধি পায়, বেশির ভাগ মুসলমান দ্বীনি ইলমে দুর্বল হয়ে পড়ে তখন তাবীলের বিষয়টি ব্যাপক হয়ে যায়। তাবীলের ব্যাপারে সলফে সালেহীনের কিছু বক্তব্য এখানে তুলে ধরা হলো।

**ইয়াদুন শব্দে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও তাবেঈনদের তাবীল :**

পবিত্র কোরআনের আয়াত

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وانا لموسعون

এখানে ইয়াদ শব্দের তাবীল বা ব্যাখ্যা করা হয়েছে কুওয়াত তথা শক্তি দ্বারা। যেমন মুফাসসিরগণ এই আয়াতের তাফসীরে উল্লেখ করেছেন–

حدثنى علىّ، قال :ثنا أبو صالح، قال: ثنى معاوية، عن علىّ، عن ابن عباس، قوله (وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ) يقول :بقوة.

حدثنى محمد بن عمرو، قال :ثنا أبو عاصم، قال :ثنا عيسى ;وحدثنى الحارث، قال :ثنا الحسن، قال :ثنا ورقاء جميعا، عن ابن أبى نجيح، عن مجاهد، قوله (بِأَيْدٍ) قال :بقوة.

حدثنا بشر، قال :ثنا يزيد، قال :ثنا سعيد، عن قتادة (وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ) :أى بقوّة.

حدثنا ابن المثنى، قال :ثنا محمد بن جعفر، قال :ثنا شعبة، عن منصور أنه قال فى هذه الآية (وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ) قال :بقوة.

حدثنى يونس، قال :أخبرنا ابن وهب، قال :قال ابن زيد، فى قوله (وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ) قال :بقوة.

حدثنا ابن حُمَيد، قال :ثنا مهران، عن سفيان (وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ) قال: بقوة.

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والبيهقى فى الأسماء والصفات عن ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله (والسماء بنيناها بأيد) قال :بقوة

এখানে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), হযরত মুজাহিদ (রহ.), হযরত কাতাদা (রহ.), হযরত সুফিয়ান (রহ.), হযরত মনসূর (রহ.), হযরত ইবনে যায়দ প্রমুখের তাফসীর উল্লেখ করা হয়েছে। যাতে তাঁরা বলেছেন, এখানে আইদুন অর্থ কুওয়াত তথা শক্তি।

(তাফসীরে আবু হাতেম ১০/৩৩১৩, তাবারী ২২/৪৩৮, তাফসীরে সমরকন্দী ৩/৪৩৭, তাফসীর ইবনে কাসীর ৭/৪৯, তাফসীরে দুররে মনসূর ৭/৬২৩)

বোঝা গেল, হযরত ইবনে আববাস (রা.)সহ বড় তাবেঈগণ আইদুনের তাবীল করেছেন কুওয়াত দ্বারা।

**جنب শব্দের অর্থে ইমাম, মুজাহিদ ও সুদ্দীর ব্যাখ্যা :**

مجاهد، فى قول الله :(عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِى جَنْبِ اللَّهِ) قال :فى أمر الله.

حدثنا محمد، قال .ثنا أحمد قال ثنا أسباط، عن السدىّ، فى قوله :(عَلَى مَا

فَرَّطْتُ فِى جَنْبِ اللَّهِ) قال :تركت من أمر الله.

পবিত্র কোরআনের আয়াতে جنب الله এর তাবীল বা ব্যাখ্যায় ইমাম মুজাহিদ ও ইমাম সুদ্দী বলেন, এর অর্থ হলো امر الله অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ। (তাফসীরে তাবারী ২১/৩১৫)

**ساق 'সাক' শব্দের তাবীল :**

পবিত্র কোরআনের আয়াত يوم يكشف عن ساق এর মধ্যে ساق শব্দের তাবীল বা ব্যাখ্যায় হযরত জাহহাক (রহ.), কাতাদা (রহ.) ও ইবনে জুবাইর (রহ.)-এর অভিমত :

قال الضحاك: هو امر شديد، وقال قتادة: امر فظيع وشدة الامر، وقال سعيد شدة الامر

অর্থাৎ 'সাক' শব্দের ব্যাখ্যা ইমাম জাহহাক বলেন, এর অর্থ হলো কঠিন বিষয়। ইমাম কাতাদাহ বলেন : তীব্র ও কঠিন বিষয়। ইমাম ইবনে জুবাইর বলেন : কঠিন বিষয়। (তাফসীরে কুরতুবী ২৯/৩৭)

**আল্লাহ তা'আলা নৈকট্য ও দূরবর্তিতার ব্যাখ্যা :**

ইমাম আবু হানীফা (রহ.) বলেন–

وليس قرب الله تعالى ولا بعده من طريق طول المسافة وقصرها ولكن على معنى الكرامة والهوان۔

কুরব ও বু'দের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য ও দূরবর্তী হওয়া স্থানের দূরত্ব ও স্বল্পতার পন্থায় নয় বরং মর্যাদার উঁচু-নিচুর দিক থেকে হয়ে থাকে। (আল ফিকহুল আকবর)

**فثم وجه الله এর ব্যাখ্যা :**

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন,

يعنى والله اعلم فثم الوجه الذى وجهكم الله اليه

"আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন তবে এর অর্থ হলো, আল্লাহ তা'আলা যেদিকে তোমাদেরকে ফিরিয়ে দিয়েছেন।"

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এখানে ওয়াজহুল্লাহকে কিবলা অর্থে তাবীল করেছেন।

ইমাম মুজাহিদ (রহ.) فثم وجه الله এর ব্যাখ্যায় সরাসরি قبلة الله উল্লেখ করেছেন। (আল-আসমা ওয়াসসিফাত)

أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن قتادة فى قوله :(فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ) ، قال :هى القبلة،

হযরত কাতাদা (রহ.)-এর তাবীল করেন কিবলা দ্বারা।

**وجاء ربك এর ব্যাখ্যা :**

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) কোরআনের আয়াতে وجاء ربك ব্যাখ্যা 'সওয়াব' দ্বারা করেছেন। যেমন ইমাম বায়হাকী সহীহ সনদে বর্ণনা করেন–

رواه البيهقى عن الحاكم عن ابى عمر بن السماك عن احمد بن حنبل ان احمد بن حنبل تأول قول الله تعالىٰ : وجاء ربك :أنه وجاء ثوابه هذا سند لاغبار عليه

অর্থাৎ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল বলেন, وجاء ربك অর্থ হলো তাঁর সওয়াব এসেছে। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ১০/৩২৭)

**ضحك এর তাবীল বা ব্যাখ্যা :**

ইমাম বোখারী (রহ.)-এর তাবীল বর্ণনা করেছেন ইমাম বায়হাকী (রহ.)। ইমাম বায়হাকী (রহ.) লেখেন–

روى الفربرى عن محمد بن اسماعيل البخاريؒ قال معنى الضحك فيه الرحمة۔

ফিরাবরী (রহ.) ইমাম মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বোখারী (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন, হাদীসে (আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে) যে ضحك শব্দের ব্যবহার হয়েছে। এর অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলার রহমত।

**هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَه এর ব্যাখ্যা :**

ইমাম বোখারী (রহ.)

بَابُ (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ)

এর অধীনে সূরা কাসাসের তাফসীরে পবিত্র কোরআনের আয়াতের ব্যাখ্যা এভাবে করেন–

(كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ) (القصص :٨٨) " :إِلَّا مُلْكَهُ،

এখানে الا وجهه এর ব্যাখ্যা হলো الا ملكه অর্থাৎ আল্লাহর রাজত্ব। তাহলে আয়াতের অর্থ হবে–

সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে আল্লাহ তা'আলার রাজত্ব ব্যতীত।

এই আলোচনা থেকে বোঝা গেল, আল্লাহ তা'আলার বিশেষণের ব্যাপারে সলফে সালেহীনগণ দুটি পদ্ধতিই গ্রহণ করেছেন। তাফবীজ (আল্লাহ প্রতি সোপর্দ করা) এবং তাবীল (সঠিক ব্যাখ্যা করা)।

**তাবীলের ব্যাপারে সলফদের মতামত :**

এই ব্যাপারে কয়েকজন ইমামের বক্তব্য নিম্নরূপ–

ইমাম নববী (রহ.) বলেন,

وفيه مذهبان مشهوران للعلماء۔۔ والثانى مذهب اكثر المتكلمين وجماعات من السلف وهو محكى عن مالك والاوزاعى انها تتاول على مايليق بها بحسب مواطنها۔

এই ব্যাপারে দুটি পদ্ধতি রয়েছে। ... দ্বিতীয় হলো অধিকাংশ মুতাকাল্লেমীন ও সলফে সালেহীনের এক জামা'আতের পথ ও পদ্ধতি। যাঁদের মধ্যে রয়েছেন ইমাম মালেক (রহ.), ইমাম আওযায়ী (রহ.) প্রমুখ। এই পদ্ধতি হলো অবস্থা অনুযায়ী সামঞ্জস্য তাবীল বা ব্যখ্যা করা।

ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) লেখেন–

قال ابن دقيق العيد : المنزهون لله اما ساكت عن التاويل او اما مؤول

ইমাম ইবনে দকীকুল ঈদ (রহ.) বলেন, আল্লাহ তা'আলার পবিত্র ঘোষণাকারীগণ এ বিষয়ে তাবীল করা থেকে নীরবতা অবলম্বন করেন অথবা তাবীল বা ব্যাখ্যা করেন। (ফতহুল বারী ১৩/৪১১)

ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) থেকে মোল্লা আলীকারী (রহ.) বর্ণনা করেন যে,

واكثر الخلف يؤولونها بحملها على محامل تليق بذلك الجلال الاقدس

برهان وهذا قول السلف۔
والمذهب الثالث : انها مؤولة قال برهان والاول من هذه المذاهب باطل، والآخران منقولان عن الصحابة، ونقل هذا المذهب الثالث عن على وابن مسعود، وابن عباس وام سلمة۔

যে সকল ক্ষেত্রে তাবীল বা ব্যাখ্যা জায়েয এটা দুই প্রকার : প্রথম প্রকার হলো : অধিকাংশ শাখাগত বিষয়ে। এ বিষয়ে কোনো মতভেদ নেই। দ্বিতীয় প্রকার হলো : দ্বীনের মৌলিক ক্ষেত্রে ও আল্লাহ তা'আলার বিশেষণ বিষয়ে। এ প্রকারের মধ্যে তিন ধরনের মতামত রয়েছে।

এক. বিশেষণ বিষয়ে কোনো প্রকার তাবীল বা ব্যাখ্যা করা যাবে না এবং কোনো প্রকার ব্যাখ্যা ছাড়াই বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করতে হবে। এটি হলো মুশাব্বিহা তথা দেহবাদীদের মত।

দুই. বিশেষণের তাবীল বা ব্যাখ্যা করা যাবে তবে আমরা ব্যাখ্যা না করে নীরব থাকব। সাথে সাথে আমরা তাশবীহ তথা দেহবাদী ও তা'তীল তথা বিশেষণ অকার্যকর করা থেকে বেঁচে থাকব। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وما يعلم تاويله الا الله আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না। ইবনে বুরহান বলেন, এটি সলফে সালেহীনের আকীদা-বিশ্বাস।

তিন. বিশেষণের তাবীল বা ব্যাখ্যা করতে হবে। ইবনে বুরহান বলেন, এ তিনটি পথ ও পদ্ধতির মধ্যে প্রথমটি তথা মুশাব্বিহাদের (বর্তমান সলফীদের) পথ ও পদ্ধতি, যা বাতিল ও ভ্রান্ত। পরবর্তী দুটি পথ ও পদ্ধতি তথা তাফবীজ ও তাবীল সাহাবাগণ (রা.) থেকে বর্ণিত। আর এ তৃতীয় পথ ও পদ্ধতি তথা তাবীল বা ব্যাখ্যা হযরত আলী (রা.), হযরত ইবনে মসউদ (রা.), হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এবং হযরত উম্মে সালামা থেকে বর্ণিত। (ইরশাদু ফুহুল ১৭৬, সুন্নাহ শিরোনামে ভ্রান্ত আকীদার আহ্বান ২২৫)

ومنهم من تاوله وفسره وبه اقول لانه معنى قريب عربى فصيح۔

এই হাদীস ও এরূপ অন্যান্য হাদীসে বর্ণিত বিশেষণ বিষয়ে মানুষ তিন ভাগে বিভক্ত। এর মধ্যে কেউ বলেছেন এগুলোকে গ্রহণ করতে হবে এবং যেভাবে এসেছে, সেভাবেই চালিয়ে দিতে হবে। তাবীল করা যাবে না। এ বিষয়ে কোনো কথা বলা যাবে না (অর্থাৎ তাফবীজ)। সাথে সাথে বিশ্বাস রাখতে হবে কোনো কিছু আল্লাহ তা'আলার ন্যায় নয়। আবার কেউ তাবীল ও তাফসীর করেছেন। আমি এ তাবীল ও তাফসীরের পক্ষে মত দিয়ে থাকি। কেননা এটা আরবী ভাষার অলংকারের অতি নিকটবর্তী। (আরেজাতুল আহওয়াজী শরহে তিরমিযী ২/২৩৪)

আল্লামা আলুসী (রহ.) বলেন–

التاويل القريب الى الذهن الشائع نظيره فى كلام العرب مما لا بأس به عندى على ان بعض الآيات مما اجمع على تاويلها السلف والخلف۔

তাবীল বা ব্যাখ্যা যদি এমন হয়, যা আকল অনুযায়ী এবং যার প্রচলন আরবী ভাষায় রয়েছে তাহলে এটাকে আমি কোনো অসুবিধা মনে করি না। কিছু আয়াত তো এমন রয়েছে, যার তাবীল বা ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সালাফ ও খালাফ একমত হয়েছেন। (আল ইকনা ফী মাসাইলিল ইজমা ১/৩২)

আল্লামা শাওকানী বলেন–

فيما يدخله التاويل وهو قسمان: احدهما اغلب الفروع، ولا خلاف فى ذلك، والثانى الاصول كالعقائد واصول الديانات وصفات البارى عز وجل وقد اختلفوا فى هذا القسم على ثلاثة مذهب۔

الاول انه لا مدخل للتاويل فيها، بل تجرى على ظاهريها ولا يؤول شئ منها وهذا قول المشبهة۔

والثانى ان لها تاويلا ولكنا نمسك عنه، مع تنزيه اعتقادنا عن التشبيه والتعطل لقوله وما يعلم تاويله الا الله قال ابن والكمال الانفس لاضطرار هم الى ذلك لكثر اهل الزيغ والبدع فى ازمنتهم۔

পরবর্তী অধিকাংশ সলফে সালেহীন আল্লাহ তা'আলার পবিত্র শান ও কামালাতের সাথে সামঞ্জস্য তাবীল বা ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁদের সময়ে বিদ'আতী ও গোমরাহদের ব্যাপকতা লাভ করার কারণেই তাঁরা তাবীল বা ব্যাখ্যা করতে বাধ্য হয়েছেন।

(মিরকাত শরহে মিশকাত ১/১৩৪)

অন্যত্র তিনি লেখেন–

اتفق السلف والخلف على تنزيه الله تعالى عن ظواهر المتشابهات المستحيلة على الله تعالى۔۔۔ وخاض اكثر الخلف فى التاويل لكن غير جازمين بان هذا هو مراد الله تعالى من تلك النصوص ، وانما قصدوا بذلك صرف العامة عن اعتقاد ظواهر المتشابه والرد على المبتدعة المتمسكين باكثر تلك الظواهر۔

পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সলফে সালেহীনগণ একমত যে, মুতাশাবিহাতের বাহ্যিক অর্থ আল্লাহ তা'আলার ক্ষেত্রে অসম্ভব হওয়ায় আল্লাহ তা'আলা তা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। ... পরবর্তী অধিকাংশ সলফে সালেহীন তাবীল বা ব্যাখ্যা করেছেন। তবে তাঁরা এ সকল বিশেষণের ব্যাখ্যা বা রূপক অর্থকে একেবারে নির্দিষ্ট করেননি। অর্থাৎ বলেননি যে এটাই আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য বা চূড়ান্ত অর্থ। এই তাবীল বা ব্যাখ্যা দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য হলো মুতাশাবিহাতের বাহ্যিক অর্থ থেকে সাধারণ মুসলমানদের ফিরিয়ে রাখা। এবং যারা মুতাশাবিহাতের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করেছে, সে সকল বিদ'আতীর প্রতিবাদ করা। (মিরকাত ১/১৮৯)

হযরত আবু বকর ইবনুল আরবী লেখেন–

اختلف الناس فى هذا الحديث وامثاله على ثلاثة اقوال، ۔۔۔ ومنهم من قبله وامره كما جاء ولم يتأوله ولا تكلم فيه مع اعتقاده ان الله ليس كمثله شى

এই আলোচনায় বোঝা গেল, আল্লাহ তা'আলার বিশেষণের ক্ষেত্রে সলফে সালেহীনের দুটি রীতিই স্বীকৃত ছিল। একটি তাফবীজ, আরেকটি হলো তাবীল বা ব্যাখ্যা। তৃতীয় আর কোনো রীতি সলফে সালেহীন গ্রহণ করেননি। বরং যারা অন্য রীতি গ্রহণ করেছে তাদের বাতিল ফিরকা বলেই ঘোষণা করেছেন। যারা বাহ্যিক অর্থকেই আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য বলে থাকে তাদের মতকে বাতিল বলে সলফে সালেহীনরাই ঘোষণা করেছেন। যা আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ তা দ্বারা দেহবাদী আকীদা সৃষ্টি হয়, যা সম্পূর্ণ শিরকী আকীদা। বর্তমান সলফী লা-মাযহাবীরা ওই তৃতীয় তথা দেহবাদী আকীদাকেই মুসলমানদের মাঝে প্রতিষ্ঠা করতে ব্যস্ত। যার কারণে তারা সলফে সালেহীনের তাফবীজ এবং তাবীলকে বিদ'আত শিরিক বলে থাকে আর তাদের আকীদাকে সহীহ আকীদা বলে প্রচার করে থাকে। সে কারণেই আমরা শুরুতে বলে এসেছি লা-মাযহাবীদের এই আকীদা আসলে আগেকার স্পষ্ট বাতিল ফিরকা কাররামিয়া ও মাজাসসিমা, মুশাব্বিহাদের আকীদারই নতুন রূপ, যা সুস্পষ্ট বাতিল এবং গোমরাহী ছাড়া কিছু নয়।

সে কারণে উলামায়ে কেরাম বলে থাকেন, লা-মাযহাবী কথিত আহলে হাদীসদের সাথে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামআতের মতভেদ শুধু উচ্চৈঃস্বরে আমীন বলা, বুকে হাত বাঁধা ইত্যাদি আনুষঙ্গিক ও শাখাগত বিষয়েই নয় বরং তাদের সাথে মূল বিরোধ হলো আকীদার বেলায়। মুসলমানদের ঈমানের শুদ্ধতা-অশুদ্ধতার সম্পর্ক আকীদার সাথে। আকীদা শুদ্ধ না হলে ঈমান ঠিক থাকবে না।

যে আকীদাকে সমস্ত সলফে সালেহীন গোমরাহ বলে এসেছেন, সে আকীদা কোনো সুস্থ মুসলমান গ্রহণ করতে পারে না। অথচ সে গোমরাহ আকীদাকেই সহীহ আকীদা বলে একদিকে মুসলমানদের বিভ্রান্ত করা হচ্ছে, অন্যদিকে পুরো সমাজে বিভক্তি ও মতবিরোধ, এমনকি ফিতনা সৃষ্টি করা হচ্ছে।

**ইমাম মালেক (রহ.)-এর বক্তব্যের রহস্য :**

লা-মাযহাবীরা আকীদাগত সকল বক্তব্যে ইমাম মালেক (রহ.)-এর একটি বক্তব্য উপস্থাপন করে থাকে। মনে হবে তাদের আকীদাকে সলফে সালেহীনের আকীদা বলে প্রমাণ করার জন্য এটিই তাদের প্রধান দলিল। সে ব্যাপারে কিছু বিষয় আমাদের জানার একান্ত প্রয়োজন আছে।

বলা হয়ে থাকে, ইমাম মালেক (রহ.)-এর কাছে 'ইস্তিওয়া' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন,

اَلْاِسْتِوَاءُ مَعْلُوْمٌ وَالْكَيْفُ مَجْهُوْلٌ وَالْاِيْمَانُ بِهٖ وَاجِبٌ وَالسُّوَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ۔(شرح العقيده الطحاويه لابن ابى العز ج ١ ص١٨٨ الرد على الجهمية لابن منده :ص١٠٤)

'ইস্তাওয়া জ্ঞাত বিষয়, স্বরূপ অজ্ঞাত বিষয়, এর ওপর ঈমান আনা ওয়াজিব এবং এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা বিদ'আত।

এই বাক্য থেকে লা-মাযহাবীরা বলেন, ইমাম মালেক (রহ.) বলেছেন, ইস্তিওয়া (তথা আল্লাহ তা'আলার আরশে সমাসীন হওয়া) সাব্যস্ত এবং এর স্বরূপ ও আকৃতি অজ্ঞাত। সুতরাং বিশেষণের বাহ্যিক অর্থ আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করে স্বরূপকে অজ্ঞাত বলা সলফে সালেহীনের রীতি।

আমাদের জানতে হবে, লা-মাযহাবীদের এই বক্তব্যে কী কী অজানা রহস্য লুকায়িত আছে?

১। ইমাম মালেক সম্পর্কে এই বাক্যটি খুবই প্রসিদ্ধ হলেও মূলত বিষয়টি হুবহু এভাবে ইমাম মালেক থেকে সহীহ সনদে প্রমাণিতই নয়। (আততালীক আলা কিতাবিল আসমাই ওয়াস সিফাত ২/১৫১)

বরং ইমাম বায়হাকী (রহ.) কিতাবুল আসমা ওয়াস সিফাতে (২/১৫০), এবং আল্লামা ইবনে হাজর আসকলানী (রহ.) বোখারী শরীফের বিখ্যাত ব্যাখ্যা গ্রন্থ ফতহুল বারীতে (১৩/৪৯৮) উন্নত সনদে ইমাম মালেক (রহ.)-এর ঘটনা উল্লেখ করেছেন।

আব্দুল্লাহ বিন ওয়াহাব বলেন, আমরা ইমাম মালেক (রহ.)-এর কাছে বসা ছিলাম, এক ব্যক্তি এসে ইমাম মালেক (রহ.)-কে বলতে লাগলেন,

يَا اَبَا عَبْدِاللّٰهِ !اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ كَيْفَ اسْتِوَاءُهُ ؟

হে আবু আব্দুল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা আরশে ইস্তিওয়া গ্রহণ করেছেন। ইস্তিওয়াটি কিভাবে?

ইবনে ওয়াহাব (রহ.) বলেন, এই কথা শুনে ইমাম মালেক (রহ.) মাথা ঝুঁকিয়ে ফেললেন, এমতাবস্থায় তাঁর শরীরে ঘাম ঝরতে লাগল। অতঃপর মাথা উঠালেন এবং বললেন,

اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ كَمَا وَصَفَ نَفْسَه لَا يُقَالُ كَيْفَ؟ وَكَيْفَ عَنْه مَرْفُوْعٌ

রহমান (তথা আল্লাহ তা'আলা) আরশে ইস্তিওয়া গ্রহণ করেছেন, যেমন তিনি নিজেই বলেছেন। এটা বলা যাবে না যে, এটি কিভাবে? (অর্থাৎ এর স্বরূপ বলা যাবে না) এবং আল্লাহ তা'আলা আকৃতির ঊর্ধ্বে। (অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আমাদের কল্পিত স্বরূপ ও আকৃতি প্রকৃতির ঊর্ধ্বে)

এতে স্পষ্ট বোঝা গেল, ইমাম মালেক (রহ.)ও বিশেষণের বাহ্যিক অর্থ নিতেন না। বরং তাফবীজ ইলাল্লাহই ছিল তাঁর পদ্ধতি।

واخرج البيهقى بسند جيد عن عبدالله بن وهب، قال :كنا عند مالك، فدخل رجل فقال :يا أبا عبدالله ?الرحمن على العرش استوى ?كيف استوى؟

فاطرق مالك فأخذته الرحضاء ثم رفع راسه، فقال :الرحمن على العرش استوى، كما وصف به نفسه، ولايقال كيف وكيف عنه مرفوعفتح البارى لابن حجر، باب وكان عرشه على الماء :٢٠/٤٩٤)

২। যদি উল্লিখিত বাক্য ইমাম মালেক (রহ.) থেকে প্রমাণিতও হয় তবে দেখার বিষয় হলো, তিনি উক্ত বাক্যে এ কথা কোথায় বলেছেন, যে ইস্তিওয়া অর্থ উস্তিকরার তথা সমাসীন হওয়া এবং সেটা জ্ঞাত বিষয়। বরং সে ক্ষেত্রেও তিনি এ কথা বলেছেন যে, ইস্তিওয়া শব্দটি যেহেতু আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কোরআনে নিজের সিফাত হিসেবে উল্লেখ করেছেন, সেটা আমাদের জানা বিষয়। কিন্তু কায়ফিয়াত মজহুল তথা এর স্বরূপ-আকৃতি-প্রকৃতি আমাদের জানা নেই। বরং আল্লাহ তা'আলাই জানেন।

যেমন আল্লামা আলুসী (রহ.) বলেন, الاستواء غير مجهول এর অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলা ইস্তিওয়া বিশেষণটি কোরআন-হাদীসে উল্লেখ আছে সে কারণে তা অজানা নয় বা জানা আছে। এর উদ্দেশ্য এই নয় যে ইস্তিওয়া শব্দটির অর্থ 'সমাসীন হওয়া' জানা আছে।

ليس نصاً فى هذ المذهب لاحتمال أن يكون المراد من قوله :غير مجهول، انه ثابت معلوم الثبوت لا أن معناه وهو الاستقرار غير مجهول- (روح المعانى، الاعراف، تحت آية رقم:٥٤)

৩। সলফে সালেহীনগণ যেখানে কায়ফিয়াত মজহুল বলেছেন, সেখানেই এর অর্থ হলো এর উদ্দেশ্য আমাদের জানা নেই।

সুতরাং হযরত ইমাম মালেক (রহ.)-এর এই বাক্য থেকে কোনোভাবেই এই কথা প্রমাণ করা যাবে না যে বিশেষণের ক্ষেত্রে বাহ্যিক অর্থ আল্লাহ তা'আলার জন্য সাব্যস্ত করা যাবে। বরং সলফে সালেহীনের যে আকীদা এর উদ্দেশ্য ও অর্থ আল্লাহর সোপর্দ করা-এটিই প্রমাণিত হবে।

তাতে বোঝা গেল, লা-মাযহাবীদের আকীদাকে সহীহ আকীদা প্রমাণের প্রধান দলিলটিও তাদের পক্ষে নয় বরং তাদের বিপক্ষে।

৪। ইমাম মালেক (রহ.)-এর বক্তব্য اَلْاِسْتِوَاءُ مَعْلُوْمٌ থেকে যদি বলা হয় এর অর্থ আমাদের জানা। তখন দেখতে হবে তিনি এখানে কোন অর্থের দিকে ইঙ্গিত করেছেন? কারণ ইস্তিওয়ার অর্থ তো অনেক আছে। লা-মাযহাবীরা যে অর্থ গ্রহণ করে তথা সমাসীন হওয়া বা বসা-এই অর্থ ইমাম মালেক (রহ.)-এর কখনো উদ্দেশ্য হতে পারে না। কারণ মালেকী মাযহাবের ঐক্যবদ্ধ মত হলো, আল্লাহ তা'আলা আরশের ওপর বসা বা সমাসীন বলা কুফরী কালাম। যার আলোচনা আমরা পূর্বে করে এসেছি। সুতরাং লা-মাযহাবীদের নেওয়া অর্থ তো এখানে কোনোমতেই উদ্দেশ্য হতে পারে না। হতে পারে এমন কোনো অর্থ তাঁর অন্তরে ছিল, যা আল্লাহ তা'আলার জন্য প্রযোজ্য। তাতেও বোঝা যায়, বাহ্যিক অর্থ আল্লাহ তা'আলার জন্য সাব্যস্ত করা সলফে সালেহীনদের কারো রীতি ছিল না।

ইস্তিওয়ার অর্থ সম্পর্কে আমরা পরে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

৫। ইমাম মালেক থেকে সহীহ সনদে যে বর্ণনাটি পাওয়া যায় তাতে উল্লেখ করা হয়েছে প্রশ্নকারীর প্রশ্ন শোনার পর তাঁর শরীরে ঘাম আসে, তিনি মাথা ঝুঁকিয়ে ফেলেন। তাতে কী বুঝলেন? লা-মাযহাবীরা যেভাবে সহজেই বলে ফেলে আল্লাহ তা'আলা আরশে সমাসীন তা যদি এতই সহজ হতো এবং এই অর্থই যদি সলফে সালেহীনের কাছে গৃহীত হতো, তবে ইমাম মালেক (রহ.)-এর শরীর এভাবে ঘেমে গেল কেন? তিনি মাথা ঝুঁকালেন কেন? তাতেই স্পষ্ট প্রমাণিত হয়, লা-মাযহাবীরা এসব বিশেষণকে যত সহজ বলে প্রচার করছে, তা এতই সহজ নয়। এর মধ্যে সামান্য কমবেশি করার মধ্যে ঈমান এবং কুফরের বিষয় বিদ্যমান। সে কারণেই ইমাম মালেক (রহ.) প্রশ্নটি শ্রবণমাত্রই স্বাভাবিক অবস্থার ওপর স্থির থাকতে পারেননি।

যে বিষয়টি ইমাম মালেক (রহ.)-এর মতো বিশ্বসেরা ইমামুল হাদীস ওয়াল ফিকহের জন্য কঠিন থেকে কঠিন বিষয় ছিল, আজকের জমানায় সেটা লা-মাযহাবীরা এত সহজ করে বলে দেওয়ার অর্থই বা কী? এর অর্থই হলো, খুব সহজ পদ্ধতিতে মুসলমানদের মাঝে কুফরী আকীদার অনুপ্রবেশ ঘটানো এবং সলফে সালেহীন থেকে দূরে সরিয়ে মুসলিম উম্মাহকে আকীদাগত বিভ্রান্তির দিকে ঠেলে দেওয়া।

**ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর বক্তব্যের বিশ্লেষণ :**

ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর কয়েকটি বক্তব্য নিয়ে লা-মাযহাবীরা বলে যে হানাফীরা মাসআলায় ইমাম আবু হানীফাকে মানে; কিন্তু আকীদার ব্যাপারে মানে না। এসব বলে অনেককে উপহাসও করতে দেখা যায়। অথচ এসব যে তাদের অজ্ঞতা এবং হীনমন্যতা তা নিজেরাও বোঝে না। অনেক সময় এসব বলে বিভ্রান্তি সৃষ্টিও উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। তাই সে ব্যাপারেও সামান্য আলোকপাত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা হয়েছে। তারা সচরাচর যে উদ্ধৃতিগুলো উপস্থাপন করে থাকে তার একটি হলো :

১.

فماذكره الله تعالىٰ فى القرآن من ذكر الوجه، واليد، والنفس فهو له صفات بلا كيف ولايقال :إن يده قدرته أو نعمته، لأن فيه ابطال الصفة وهو قول اهل القدر والا عتزال (الفقه الأكبر مع شرحه للملا على القارى، ص:٦٧)

ইমাম আবু হানীফা (রহ.) বলেছেন,

আল্লাহর বিশেষণ ইয়াদ ইত্যাদিকে কুদরত, নিয়ামত ইত্যাদি দ্বারা ব্যাখ্যা করা যাবে না।

ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর এই বক্তব্যকেও লা-মাযহাবীরা পুঁজি করে মুসলমানদের মাঝে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে দেখা যায়। অথচ ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর পুরো বক্তব্যের ওপর নজর দিলেই বোঝা যায় এখানে তাঁর উদ্দেশ্য কী?

ইমামে আজম (রহ.) বলেছেন,

لأن فيه ابطال الصفة وهو قول اهل القدر والا عتزال

অর্থাৎ তাবীল করা যাবে না এর কারণ হলো, এরূপ তাবীলের কারণে মূল অর্থ বাতিল হয়ে যায়। এসব কাদরিয়া এবং মু'তাযিলা ফিরকার রীতি।

এখানে দুটি বিষয় : একটি হলো অর্থ বাতিল হয়ে যাওয়া। অথচ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা হলো এগুলোর শাব্দিক অর্থ বহাল থাকবে। কিন্তু এই বাহ্যিক অর্থকেই আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য বলা যাবে না। সুতরাং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত যে তাবীল করে থাকে, তাতে বাহ্যিক অর্থ বাতিল হয় না।

দ্বিতীয়ত : এটি কাদরিয়া ও মু'তাযিলার রীতি। মু'তাযিলা ও কাদরিয়াদের ন্যায় তাবীল করা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সকলের নিকট নাজায়েয। কারণ তারা যে তাবীল করে, সেটাকেই চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হিসেবে ধরে নেয়। আর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত যে তাবীল করে, সেটা সম্ভাব্য উদ্দেশ্য হিসেবেই করে থাকে।

ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর বক্তব্যের উদ্দেশ্য হলো এমন তাবীল করা যাবে না, যার কারণে বাহ্যিক অর্থ বাতিল হয়ে যাবে এবং তা মু'তাযিলা এবং কাদরিয়াদের ন্যায় চূড়ান্ত ও নিশ্চিত উদ্দেশ্য মনে করা হবে। সুতরাং ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর উল্লিখিত বক্তব্য নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়ানোর সুযোগ নেই।

যদি তাঁর উদ্দেশ্য তাবীল বা ব্যাখ্যা করার কোনোই সুযোগ না থাকত তবে তিনি নিজেই তাবীল করতেন না। অথচ বিশেষণ বিষয়ে বিভিন্ন স্থানে তিনিও তাবীল করেছেন। যার সামান্য নমুনা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

বোঝা গেল, তাফবীজ এবং তাবীলই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের রীতি। এতে সকলে একমত।

২. লা-মাযহাবী আহলে হাদীসরা ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর ব্যাপারে এরূপ একটি বক্তব্যও প্রচার করে থাকে-

قال سألت أبا حنيفة عمن يقول لا أعرف ربى فى السماء أو فى الأرض فقال :قد كفر لأن الله تعالى يقول :( الرحمن على العرش استوى ) وعرشه فوق سماواته ، فقلت :إنه يقول أقول على العرش استوى ولكن قال لا يدرى العرش فى السماء أو فى الأرض ، قال : إذا أنكر أنه فى السماء فقد كفر رواها صاحب الفاروق بإسناد عن أبى بكر بن نصير بن يحيى عن الحكم .

"এমন লোকের ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা (রহ.) হতে জিজ্ঞেস করা হয়েছে, যে বলে আল্লাহ তা'আলা কি আসমানে নাকি জমিনে, তা আমি জানি না। ইমাম আবু হানীফা উত্তরে বললেন, সে কুফরী করল। কারণ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, الرحمن على العرش استوى আর তাঁর আরশ হলো আসমানের ওপরে। সে যদি বলে, আমি জানি না আরশ আসমানে নাকি জমিনে। ইমাম আবু হানীফা (রহ.) বললেন, সে যদি আরশ আসমানে থাকার বিষয়টি অস্বীকার করে তবে সে কুফরী করল।"

এই বক্তব্য উপস্থাপন করে লা-মাযহাবীরা বলে থাকে যে ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর আকীদা হলো আল্লাহ তা'আলা আরশের ওপর উপবিষ্ট। সর্বত্র বিরাজমান হওয়ার আকীদাটি কুফরী।

অথচ হুবহু এই বক্তব্যটি ইমাম আবু হানীফা (রহ.) থেকে সহীহ সনদে প্রমাণিত নয়। বরং এই বক্তব্যটি ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর নামে কোনো অসৎ উদ্দেশ্যে বিকৃত আকারেই উপস্থাপন করা হয়েছে। এতদসম্পর্কে ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর মূল বক্তব্য হলো নিম্নরূপ :

قَالَ ابو حنيفَة من قَالَ لَا اعرف رَبِّى فِى السَّمَاء اَوْ فِى الأَرْض فقد كفر وَكَذَا من قَالَ إِنَّه على الْعَرْش وَلَا ادرى الْعَرْش أَفِى السَّمَاء اَوْ فِى الأَرْض (الفقه الأكبر ص :١٣٥)

আবু মুতী বলখী বলেন, "ইমাম আবু হানীফা (রহ.) বলেছেন, যে লোক বলল আল্লাহ তা'আলা কি আসমানে নাকি জমিনে, তা আমি জানি না, সে কুফরী করল। যে বলল, আল্লাহ তা'আলা আরশের ওপর তবে আরশ কোথায় আমি জানি না, সে কুফরী করল।"

এই বক্তব্যটিতে উক্ত বাক্যগুলো কুফরী বলার কারণ স্পষ্ট যে তার বক্তব্য 'আল্লাহ তা'আলা আসমানে নাকি জামিনে'-এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলার জন্য সীমা এবং স্থান সাব্যস্ত হয়। সুতরাং তা কুফরীই হবে। পরের বাক্যতে বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা আরশের ওপর; কিন্তু তা আসমানে নাকি জমিনে, তা আমি জানি না। তাও কুফরী। কারণ সেখানেও আল্লাহ তা'আলার জন্য স্থান-কাল-পাত্র সাব্যস্ত হচেছ। সুতরাং এই বক্তব্য নিয়ে মুসলমানদের মাঝে বিভ্রান্তি সৃষ্টির কোনোই সুযোগ নেই। কিন্তু লা-মাযহাবীরা ইমাম আবু হানীফার যে বক্তব্য প্রচার করে থাকে, তা মিথ্যা এবং বিকৃত।

ইমাম আবু হানীফা সম্পর্কে লা-মাযহাবীদের প্রচারিত যাবতীয় বিভ্রান্তির নিরসন হয়ে যায় তাঁর এই স্পষ্ট আকীদা থেকে।

*(চলবে ইনশাআল্লাহ)*